নারীশক্তি

বিনোবা

অনুবাদ

অলকা সেনগুপ্তা
পরমেশ বসু

সর্বোদয় প্রকাশন সমিতি
সি-৫২, কলেজ স্ট্রীট মার্কেট
কলিকাতা-৭০০০১২

প্রকাশক
বিধুভূষণ দাশগুপ্ত
সর্বোদয় প্রকাশন সমিতি
সি-৫২ কলেজ স্ট্রীট মার্কেট
কলিকাতা-৭০০০১২.

প্রথম প্রকাশ :
মার্চ ১৯৬৩—৩৩০০

মুদ্রক :
শ্রীহরিপদ সামন্ত
কে. বি. প্রিণ্টার্স
১।১এ, গোয়াবাগান
কলিকাতা-৭০০০০৬

ভূমিকা

যন্ত্রের এই সুবিধে যে শরীর শ্রমের শক্তি যদি কমও থাকে, তাহলেও কাজ সহজে করে নেওয়া যেতে পারে। যতদিন পর্যন্ত যন্ত্রপাতির সৃষ্টি হয়নি ততদিন পর্যন্ত যে বেশী পরিশ্রম করতে পারত জীবনে প্রতিষ্ঠালাভ করত সে-ই। ভীমসেন আর হারকিউলিসের দেহে হাজার হাতীর বল ছিল। প্রাগ্-যান্ত্রিক যুগে এধরণের মল্লবীরদেরই হয়ত আধিপত্য ছিল। তারপর যন্ত্রপাতির আবিষ্কারের সঙ্গে-সঙ্গে বাহুবলের চেয়ে যন্ত্রকুশলতার মূল্য গেল বেড়ে। যন্ত্রের ক্ষেত্রের যে বিকাশ-ক্রম প্রযোজ্য অস্ত্র-শস্ত্রের বেলাও তা-ই। যন্ত্রে আর অস্ত্রে যেমন-যেমন অধিকমাত্রায় নৈপুণ্য আর সূক্ষ্মতার প্রাধান্য দেখা দিতে আরম্ভ করল তেমন-তেমন দৈহিকশক্তির চেয়ে উপকরণ আর অস্ত্রকুশলতার গুরুত্ব বাড়তে থাকল। এই বিকাশের মূলগত ভাবটি পুরানো সংস্কৃতবাক্যে সুন্দরভাবে ব্যক্ত করা যায়— 'বুদ্ধির্যস্য বলং তস্য।'

মানব-প্রগতি দৈহিকশক্তি থেকে বুদ্ধিশক্তির দিকে এগিয়ে চলেছে এবং আজ এমন অবস্থার সৃষ্টি হয়েছে যেখানে বৈজ্ঞানিক যন্ত্রপাতির সামনে দেহবল ও জনবল অর্থহীন হয়ে পড়েছে। এতে নারী দৈহিকশক্তিতে পুরুষ অপেক্ষা দুর্বল হওয়া সত্ত্বেও আর 'অবলা' বা 'রক্ষণাকাংক্ষিণী' অথবা 'পরাধীন' নয়। অস্ত্রবিদ্যা ও যন্ত্রবিদ্যার বিকাশের গতি যেদিকে তা থেকে এই স্থির সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া যায় যে, যেখানে মনোবল ও বুদ্ধিবল বেশী থাকবে সেখানে আসল শক্তি এবং তার প্রভাব পরিলক্ষিত হবে। বিজ্ঞানের প্রগতি শক্তির দিক থেকে নারী ও পুরুষকে সমপর্যায়ে এনে দিয়েছে।

এতদিন ধরে নারীর জীবন পুরুষনির্ভর ও পুরুষ মুখাপেক্ষী ছিল। তাই তার মধ্যে আত্মবলিদান, আত্মোৎসর্গ, দুঃখসহনের অতুলনীয় শক্তি নিহিত থাকা সত্ত্বেও আপন পরিবার ও সমাজে তার স্থান গৌণ ছিল। ঈশ্বরভক্তিতে মগ্ন ও আত্মানুসন্ধী পুরুষের বিচারে নারী ছিল মোক্ষমার্গের পথে প্রধান বাধা। সংস্কৃতিসম্পন্ন লোকেরা নারীকে নিয়ে চর্চা করাকে বিষয়াসক্তির লক্ষণ বলে মনে করেছে। বিরাগী পুরুষেরা নারীর মুখাবলোকন করাকেও নিষিদ্ধ কাজ বলে মনে

করেছে। বিলাসী ও কবিরা নারীকে দেখেছে বিলাস ও উপভোগের সাধনরূপে। গৃহীলোক নারীকে মাতা, ভগিনী আর কন্যারূপে দেবতা ও পবিত্রতার প্রতিমূর্তি জ্ঞান করেছে। কিন্তু এর মধ্যে কেউ-ই নারীকে মানুষ হিসেবে সমানাধিকার দেয়নি বা সমবলী বলে তাকে কেউ মনে করেনি। কিন্তু বর্তমান সমাজ জীবনে নারী পুরুষের সঙ্গে সমানভাবে নাগরিক অধিকার পেয়েছে। তাই আজ তাকে আপন নারীত্ব রক্ষা ও তার বিকাশ সাধনের জন্যে পুরুষ-নির্ভর জীবন ও পুরুষ মুখাপেক্ষিতার উর্ধ্বে উঠতে হবে। সমাজে নারী আর পুরুষ পরস্পরের সহযোগী হবে। উভয়ের জীবন হবে পরস্পর-সাপেক্ষ এবং পরস্পরের পরিপূরক। অতঃপর নারীজীবন পুরুষ মুখাপেক্ষী এবং পুরুষ নির্ভরশীল হবে না। এ তখনই হতে পারে যখন পরম্পরাসূত্রে প্রাপ্ত ভ্রান্ত ধারণাগুলি থেকে নিজেকে মুক্ত করে নিয়ে নারী হবে 'স্ব-রক্ষিতা'। এরজন্য যতখানি প্রয়োজন উজ্জ্বল চরিত্র-বলের ঠিক ততখানি প্রয়োজন পবিত্র জীবিকার বা জীবনোপায়ের। আনুষ্ঠানিকভাবে নারীকে যে নাগরিক অধিকার দেওয়া হয়েছে তাকে বাস্তবে রূপায়িত করতে পারে একমাত্র নিষ্কলঙ্ক চরিত্রশক্তি আর শুদ্ধ জীবনযাত্রা।

শোষিত শ্রেণীর মধ্যে নারী ছিল সর্বাধিক শোষিত। নিকৃষ্ট থেকে নিকৃষ্টতর পুরুষের প্রভুত্ব আজ পর্যন্ত তার উপর রয়েছে। এজন্যে বিধান ও সংবিধানে যে-পরিবর্তনের আবশ্যকতা ছিল তার মধ্যে প্রধান-প্রধান পরিবর্তন অন্যান্য সভ্যদেশের মতো আধুনিক ভারতেও করা হয়েছে। এছাড়া অন্যান্য প্রয়োজনীয় পরিবর্তনও হয়ে চলেছে। কিন্তু নারীদের মধ্যে সংবিধান ও আইন থেকে সুবিধা গ্রহণ করার শক্তিও চারিত্রিক এবং আধ্যাত্মিক বল থেকেই আসতে পারে। এর ইঙ্গিত বিনোবার প্রবচনগুলির মধ্যে রয়েছে। বিজ্ঞানযুগ আত্মবলের পথ প্রশস্তকারী। অতএব বর্তমান যুগকে নারীর স্বাধীন জীবনের পুণ্যারম্ভ বলা যেতে পারে।

কাশী —দাদা ধর্মাধিকারী

১১ অক্টোবর '৫৮।

নিবেদন

'নারীশক্তি' হিন্দী 'স্ত্রী-শক্তি'-র বঙ্গানুবাদ। হিন্দীতে এর তিনটি সংস্করণ প্রকাশিত হয়ে গেছে। বাংলায়ও এ বইটি অনেক আগেই প্রকাশিত হয়ে যেত। কিন্তু ছাপাখানায় দেওয়ার পূর্বমুহূর্তে হিন্দীর তৃতীয় সংস্করণ এসে যাওয়ায় দেখা গেল যে আগের বইয়ের সঙ্গে তার প্রায় মিল নেই বললেই চলে। ফলে আবার নতুন করে অনুবাদ করতে হল।

বইটির গুরুত্ব সম্বন্ধে এখানে কিছু উল্লেখ করা নিষ্প্রয়োজন। তবু এইটুকু বলা দরকার যে, 'নারীশক্তি' কেবল মা-বোনেরাই নন, এই বইটি পড়ে পুরুষেরাও যথেষ্ট লাভবান হবেন। বিজ্ঞান ও আত্মজ্ঞান যে আগত দিনের ইঙ্গিত বহন করছে তার যোগ্য নাগরিক হতে হলে কী অবলম্বন করে এগিয়ে যাওয়া প্রয়োজন তার সরল অথচ জ্ঞানগর্ভ আলোচনা এতে রয়েছে। মূল্যের দিকে লক্ষ্য রেখে বইটিতে কোন পরিশিষ্ট রাখা হয়নি। আমরা আশা করি আমাদের অন্যান্য বইগুলির মতো এই বইটিও সকলের সমাদর লাভ করবে।

বিনোবা পদযাত্রী দল
ভগবানগোলা (মুর্শিদাবাদ) —পরমেশ বসু
৮. ১২. ৬২

সূচীপত্র

আধ্যাত্মিক সমতা

নারী-পুরুষের মধ্যে কোন ভেদ রয়েছে এমন কোন কল্পনাই আমার মনে আসে না। আমার বিচারে সামাজিক, পারিবারিক ও রাষ্ট্রিক অধিকার ও কর্তব্য পুরুষের ক্ষেত্রে যা নারীর ক্ষেত্রেও তাই। উভয়ের অর্থনৈতিক অধিকার সমান এবং নৈতিক যোগ্যতাও এক। তাদের শিক্ষা-দীক্ষা এক-সঙ্গে হওয়া উচিত, শিক্ষার বিষয়বস্তুও এক হওয়া বাঞ্ছনীয়। নারী ও পুরুষের ভেদ মূলগত নয়, বাহ্যিক। অন্য এক চিন্তাধারাও আছে। কিন্তু আমি আমার বিচার উপস্থিত করছি। নারী ও পুরুষের মধ্যে একই মানবাত্মা বিরাজ করে, কাজেই বাহ্যিক ভিন্নতা যা রয়েছে তার উপর গুরুত্ব আরোপ করার কোন আবশ্যকতা নেই। বাহ্যিক ভিন্নতার দরুন উভয়ের কার্যক্ষেত্রে কিছুটা পার্থক্য থাকা স্বাভাবিক, কিন্তু শুধু এর উপর নির্ভর করে যে ভেদ ভাব আমাদের মধ্যে বদ্ধমূল হয়ে আছে তাকে যুক্তিযুক্ত বলা যায় না।

কাব্যশক্তির অনর্থকারিতা

মধ্যযুগে ভারতবর্ষে এমন কিছু চিন্তানায়কের আবির্ভাব হয়েছিল যাঁরা নারী-পুরুষের মধ্যে একটা মৌলিক ভেদ আছে বলে মনে করতেন। কবিত্ব-শক্তি ছিল তাঁদের একমাত্র অবলম্বন। সাংখ্যদার্শনিকেরা সৃষ্টি-তত্ত্বের আলোচনা করতে গিয়ে দুইটি মূলতত্ত্বের সন্ধান পেয়েছেন। একটি বিচিত্র রূপের প্রাণহীন, জড় পদার্থ, অপরটি রসময় প্রাণময় চেতনশক্তি। তাঁরা একটির নাম দিয়েছেন 'প্রকৃতি' ও অপরটির নাম 'পুরুষ'। আর এ দুয়ের সংযোগে জগৎ চলছে। 'প্রকৃতি' স্ত্রীলিঙ্গ শব্দ ও 'পুরুষ' পুংলিঙ্গ এবং এই শব্দগত

লিঙ্গভেদ দেখিয়ে কবিরা বললেন, নারী 'প্রকৃতি-তত্ত্বে'র প্রতিভূ আর পুরুষ 'পুরুষ-তত্ত্বে'র। কোনো কোনো বিচারক এর রূপায়ণ করলেন আরও গভীরে গিয়ে। তাঁরা মত প্রকাশ করলেন যে, নারী সংসারাসক্ত, মোক্ষ-লাভের অধিকারিণী সে হতে পারে না। মোক্ষলাভ করতে হলে তাকে পুরুষ হয়ে জন্মাতে হবে। এরূপ বিচারকে আমল দেওয়ার ব্যাপারে বিকৃত বুদ্ধি আর কাব্যশক্তি ছাড়া তাঁদের আর কিছু অবলম্বন ছিল বলে মনে হয় না। কিন্তু সাংখ্যদর্শনে ত প্রকৃতিকে 'প্রধান'ও বলা হয়েছে এবং 'প্রধান' শব্দটি পুংলিঙ্গ।

বস্তুত নারী ও পুরুষের মধ্যে একই চেতনাবাদী পুরুষতত্ত্ব বিরাজ করছে এবং উভয়ের দেহই এক প্রকৃতি-তত্ত্বের ফলস্বরূপ। উভয়েরই সংসারাসক্তি ও সংসারবন্ধন যেমন সমান, তেমনি মোক্ষের অধিকারও এক। কিন্তু কাব্য-শক্তি যে কতখানি অনর্থ করতে পারে প্রকৃতি ও পুরুষ শব্দ তার এক উদাহরণ হয়ে আছে।

সংস্কৃত কাব্যে পড়েছিলাম যে, দময়ন্তীর মহলে বায়ুরও প্রবেশাধিকার ছিল না। কেন? এইজন্য যে বায়ু পুংলিঙ্গ শব্দ, কাজেই দময়ন্তীর মহলে পরপুরুষের স্থান আর কী করে হতে পারে। এসব পড়ার পর এই ভেবে ব্যাকুল হয়েছিলাম যে, দময়ন্তীর না জানি কী অবস্থাই হয়েছিল! কিন্তু কিছুক্ষণ পরে আশ্বস্ত হলাম। ভাবলাম, ওখানে 'বায়ু' না হোক 'হাওয়া' ত নিশ্চয়ই প্রবেশ করে থাকবে, কারণ 'হাওয়া' শব্দ স্ত্রীলিঙ্গ। শব্দের মহিমা এমন!

গুণের অভিন্নতা

নারী সংসারাসক্ত এবং পুরুষ মোক্ষ ও বৈরাগ্যধর্মী এই বিচারধারা থেকে আলাদা অন্য এক বিচারাধারাও আছে যা বলে, পুরুষ অপেক্ষা নারী শ্রেষ্ঠ। স্বভাবতই নারীর মধ্যে দয়াভাব বেশী। শিশুদের শিক্ষা ও সমাজ

শাসনের ভার নারীর হাতে দিলে অহিংস সমাজ-রচনা সহজে সম্ভব হবে। এসব কাজে নারীরা অংশগ্রহণ করুন এ আমিও চাই। আজ পর্যন্ত এ কাজ সাধারণত পুরুষরাই করে আসছে। তাই নারীরা এসবের দায়িত্ব গ্রহণ করলে এতে যে এক ধরনের নবীনতা আসবে তা আমিও স্বীকার করি। কিন্তু আধুনিক চিন্তানায়কেরা যেমন মনে করেন আমি সে ধারায় ভাবতে পারি না। কারণ, দয়া ইত্যাদি গুণ কোন জাতি বা লিঙ্গের এক চেটিয়া নয়। বাহ্যিক দৃষ্টিতে গুণাবলীর প্রকাশ ভঙ্গিমায়, তাদের বিকাশ পদ্ধতিতে পার্থক্য থাকতে পারে। কিন্তু নারী ও পুরুষের গুণের মধ্যেই পার্থক্য রয়েছে এরূপ মনে করা যুক্তিযুক্ত এমন কি বাস্তব সম্মতও নয়।

গ্রহণশক্তিতে অভিন্নতা

কিন্তু ভেদনীতিতে বিশ্বাসীরা গুণের মধ্যে বিভিন্নতা ত স্বীকার করেনই, নারী ও পুরুষের গ্রহণশক্তির মধ্যেও পার্থক্য রয়েছে বলে মনে করেন। বলা হয়ে থাকে, নারীর জন্য কাব্য অনুকূল, গণিত প্রতিকূল। পুরুষের মধ্যে পরাক্রমশীলতা বেশী থাকে ; তাই তার অধ্যয়নের বিষয়বস্তু তার বুদ্ধির গ্রহণশক্তি ও স্বভাবের অনুকূল হওয়া উচিত। অন্যদিকে নারীর মধ্যে সৌন্দর্যবোধ, করুণা প্রভৃতি সুকোমল বৃত্তি বেশী থাকে। সুতরাং তাদের গ্রহণশক্তি অনুসারেই পাঠ্য বিষয় নির্দিষ্ট হওয়া বাঞ্ছনীয়। কিন্তু আমি মনে করি, মূল স্বভাব ও পদবীজনিত যে বৈষম্য ধরা হয় তার যথাযথ বিশ্লেষণ না হওয়ার দরুনই এই ভ্রান্ত ধারণার উদ্ভব হয়েছে।

প্রতিষ্ঠায় অভিন্নতা

'নয়ী তালীম' শিক্ষা-ব্যবস্থায় বালকও রান্না করতে শেখে। এ ব্যাপারে এক ভাই আপত্তি তুলেছিলেন। তাঁর আপত্তির কারণ এই ছিল যে, বালকদের শিক্ষার সময় নষ্ট করে আমরা হেঁসেলের মধ্যে কেন তাদের ঠেলি। তাঁর

বিচারে হেঁসেলের কাজে শুধু মেয়েদেরই যাওয়া উচিত। কারণ উনুনে 'লকড়ী' (কাঠ) জ্বলে এবং 'লকড়ী' আর 'লড়কী (মেয়ে) দুইই স্ত্রীলিঙ্গ শব্দ। আমি তাঁকে বুঝিয়ে বললাম যে, উনুনে ত 'ইন্ধন'ও (জ্বালানি) জ্বলতে পারে, আর 'ইন্ধন' 'লড়কা'র (ছেলের) মতো পুংলিঙ্গ শব্দ। ছেলেদের দিয়ে রান্না করানোতে অগ্নির আপত্তি করবার কিছু নেই। ভাত বা রুটি লিঙ্গভেদ জানে না, আর নারী-পুরুষ উভয়ে একই ভাবে তা দিয়ে ক্ষুন্নিবৃত্তি করে থাকে। ক্ষুধারও লিঙ্গজ্ঞান নেই। আর কিছু না পেলে লোকে প্রতিষ্ঠার প্রশ্ন তোলে। আমাদের বোঝা উচিত যে, প্রতিষ্ঠা না নারীর, না পুরুষের। প্রতিষ্ঠা ত তারই যে তার যোগ্য। কোন কর্মবিশেষের সঙ্গেও প্রতিষ্ঠা জড়ানো নেই।

সংসর্গের দোষ-গুণ

ছেলে-মেয়েদের একসঙ্গে মেলামেশাকেও অনেকে খারাপ চোখে দেখে। তারা বলে, এ অবস্থা দুঃখজনক বলে প্রমাণিত হবে। কিন্তু প্রমাণ ত তা-ই হবে যা আমরা প্রমাণ করতে চাইব। এ আমাদের শক্তির উপর নির্ভর করে। সাধারণত, যে-কোনো দুই ব্যক্তি একসঙ্গে থাকলে যেমন কিছু গুণ আয়ত্ত হয়, তেমন কিছু দোষও। কেউ কেউ আমাকে প্রশ্ন করেন, 'আপনি কি ব্রাহ্মণ আর হরিজন ছেলেদের একই ছাত্রাবাসে রাখবেন? সংসর্গ দোষে কিছু ক্ষতি হবে না কি?' আমি বলি, 'সে ভয় আমারও আছে। ব্রাহ্মণ আর হরিজন ছেলেদের একত্রে রাখলে এ আশঙ্কা নিশ্চয়ই আছে যে, এতকালের দাম্ভিকতা যা ব্রাহ্মণ-শ্রেণীতে সীমিত ছিল, তা হরিজনদের মধ্যেও বিস্তার লাভ করতে পারে। কিন্তু আমরা যখন শিক্ষাদানের কাজে ব্রতী হয়েছি, তখন এ ধরনের আশঙ্কাসমূহকে দূর করতেই হবে। যেখানে বিপদ নেই সেখানে প্রয়োগ নেই; যেখানে প্রয়োগ নেই সেখানে শিক্ষাও নেই। আমার যদি শক্তি না থাকে তবে আমি পরাজিত হব, কিন্তু আদর্শ আদর্শই থেকে যাবে।'

গুরুমন্ত্র

একটি মেয়ে বলেছিল, 'ভগবদ্‌গীতায় নারীদের শিক্ষার জন্য কিছু আছে বলে মনে হয় না। সেখানে স্থিতপ্রজ্ঞ আছে, গুণাতীত আছে, যোগী আছে। কিন্তু স্থিতপ্রজ্ঞা, গুণাতীতা, যোগিনীর লক্ষণ সম্পর্কে কিছু বলাই হয়নি।' মেয়েটি সেখানে বোধহয় 'He ও She'-ওয়ালা নিয়ম পাওয়ার আশা করেছিল। আমি তাকে বললাম, "ও নিয়ে ভেব না। গীতা ত নিজেই স্ত্রী আর স্থিতপ্রজ্ঞ ইত্যাদি সব তাঁর উদরেই রয়েছে। আমরা গুরুমন্ত্র পেয়েছি 'তত্ত্বমসি'। সাদা-কালো, হরিজন-পরিজন, হিন্দু-মুসলমান, নারী-পুরুষ সব ভ্রম। তুমি এসব থেকে আলাদা বিশুদ্ধ আত্মা মাত্র। তুমি শব নও, শিব। তোমার-আমার ভিন্নতাই শব, মড়া। এক আত্মতত্ত্বই জীবিত। তাকে জেনে নাও আর সব ভুলে যাও। ভেদের মধ্যে অভেদকে জানাই আত্মবুদ্ধির লক্ষণ। ভেদভাবকে বাড়ানোই হীনবুদ্ধির লক্ষণ, পুরুষার্থহীনতা।"

'মহিলা-আশ্রম' পত্রিকা,
নভেম্বর, '৪৬

বিবেকযুক্ত সমতা

সমতার নীতি ত প্রত্যেক যুগের জন্যই। কিন্তু বর্তমান যুগের মতো সমতার জন্য ভূমি-বণ্টনের প্রয়োজন অন্য কোনো যুগে হয়নি। ভোটাধিকারের প্রয়োজন কোনো যুগে ছিল না, কিন্তু আজ আছে। সকলের ভোটাধিকার থাকা উচিত—আজ এই চিন্তা ও চেতনা এসেছে। ভারতে নারী ও পুরুষের মর্যাদা সমান; তাই নারীরা স্বাভাবিকভাবে ভোটাধিকার পেয়েছে। কোন-কোন পাশ্চাত্য দেশের নারীরা আজও ভোটাধিকার পায়নি এবং তার জন্য তাদের কোন আকাঙ্ক্ষাও নেই। তারা বলে, 'এ ত পুরুষদের কাজ, তারাই করুক।' কিন্তু আমাদের দেশে এ ধরনের কথা হয় না, কেন না অন্তত বিচারের দিক থেকে নারী-পুরুষের সমানতার স্বীকৃতি এখানে অতি

প্রাচীন। যদিও আচারের দিক থেকে আজও তা সহজ হয়ে ওঠেনি এবং এর সংস্কারের প্রয়োজন আছে।

আমাদের শাস্ত্র বলে, নারী ও পুরুষ উভয়েরই মোক্ষে সমান অধিকার। আধ্যাত্মিক যোগ্যতা উভয়েরই সমান। আমরা শুধু 'রাম' বা 'কৃষ্ণের' নাম নিই না, 'সীতারাম' ও 'রাধাকৃষ্ণের' নামও কীর্তন করি। ব্রহ্মবিদ্যায় আমরা যতখানি এগিয়েছি জগতে আর কেউ ততখানি এগোয়নি। নারী পুরুষের সমানতায় বিশ্বাসী বলেই আমরা একসঙ্গে 'সীতারাম' বলি, যদিও ঈশ্বর এক ও অভিন্ন— এই মূলতত্ত্ব আমাদের অজানা নয়। এই জন্যই ভারতে ভোটাধিকার লাভের জন্যে নারীদের আন্দোলন করতে হয়নি। ইংলণ্ডে মেয়েদের পঞ্চাশ বছর ধরে এর জন্য আন্দোলন করতে হয়েছিল। আজ যেমন ধনী-দরিদ্রের মধ্যে বিরোধের প্রশ্ন উঠেছে ঠিক তেমনি সেখানে নারী পুরুষে বিরোধের সৃষ্টি হয়েছিল। কিন্তু ভারতের মতো দেশে এসবের প্রয়োজন হয়নি, কারণ এখানকার হাওয়ায় নারী-পুরুষের মধ্যে আধ্যাত্মিক ও মানসিক সমানতার কথা ও সাম্যের বিচার প্রাচীন কাল থেকে চলে এসেছে।

সাম্যভাবনার সঙ্গে-সঙ্গে বিবেক বুদ্ধিও থাকা চাই। ভারতের বাইরের লোকেরা সাম্যের কথা বলে, কিন্তু সেখানে বিবেকের সঙ্গে কাজ করা হয় না। তারা হত্যা ও হিংসার মাধ্যমে সাম্য-প্রতিষ্ঠার যে কথা বলেছে, তা বিবেক-শূন্য। এ কোন সাম্য নয়, সাম্যের নামে সবাইকে এক ছাঁচে ঢালাই করার চেষ্টা। এভাবে সকলকে এক ছাঁচে তৈরি করাকে আমরা কখনো পছন্দ করি না। আমরা আত্মার সমতা স্বীকার করি এবং দেহের জন্য যতটুকু সমতা না হলে নয় ততটুকুই চাই। মা সন্তানের পুষ্টিসাধন করেন। একেবারে যে শিশু তাকে খাওয়ান দুধ, তার চেয়ে যে বড় তাকে দেন অপেক্ষাকৃত কম দুধ এবং তার চেয়ে যে বড় তাকে খাওয়ান কেবল রুটি। গণিত-শাস্ত্রের হিসেব মতো প্রত্যেককে সমান দুধ ও সমান রুটি দেন না। আমাদের সাম্য-চিন্তাও এই রকমেরই বিবেকযুক্ত। তাই আমরা যেমন পরিবারে তেমন সমাজেও

প্রত্যেককে তার ক্ষুধা ও পরিপাক-শক্তি অনুযায়ী আহার্য দেব। যার দুধের দরকার তাকে দুধ দেব, আর যার রুটির দরকার তাকে দেব রুটি। এরকম বিচার বুদ্ধির সঙ্গে যদি সাম্যের প্রতিষ্ঠা না হয় তবে তা হবে অকেজো। হিংসার পথে যে সমতা আসবে তা বিবেকশূন্যই হবে। আমরা ত চাই আধ্যাত্মিক সমতা। আমাদের সনাতন ধর্মের নীতিও তাই।

লোহারদগা
২৪ ১১. ৫২

সর্বত্র নারীশক্তি

এ কথা বোঝা দরকার যে, ভারতের প্রত্যেকের মধ্যে নারীশক্তি বিরাজ করছে। মেয়েদের মধ্যে ত এ শক্তি আছেই। যদিও তাদের মধ্যে আদৌ কোন শক্তি আছে কি-না এ সন্দেহ কিছু লোক প্রকাশ করে থাকেন। কিন্তু মেয়েদের মধ্যে ত আছেই, ভারতের পুরুষদের মধ্যেও নারীশক্তি আছে। এ এক অদ্ভুত কথা আমি বলছি। অনেকে বলে যে, নারীরা অবলা, রক্ষণ-যোগ্যা, কোন শক্তি থাকলেও তাদের রক্ষা করতেই হয়। এদেশে নারীদের অবলা বলা পরবর্তী-কালের ঘটনা। নারীদের আসল নাম ত মহিলা। মহিলা মানে মহান শক্তিশালী।.

শক্তিরূপে এদেশে নারীমূর্তিই স্বীকৃতি পেয়েছে, পুরুষমূর্তি নয়। যখন মহিষাসুর মর্দনের প্রসঙ্গ এল, মহিষাসুর দেবতা ও মানুষদের উত্যক্ত করে তোলায় যখন তার হাত থেকে মুক্তি পাওয়ার প্রশ্ন দেখা দিল, তখন সকলে বিষ্ণুর কাছে গেলেন। সেখান থেকে অবশেষে সবাই একযোগে মাতৃ-শক্তির কাছে গিয়ে তাঁকে মহিষাসুরের অত্যাচার থেকে মুক্ত করার জন্য প্রার্থনা জানালেন। সমস্ত শুনে মা যাঁর যা অস্ত্র ছিল তা সব তাঁর কাছে রাখতে বললেন। বিষ্ণু, শংকর প্রভৃতি প্রত্যেকে তাঁদের অস্ত্র মার কাছে রাখলেন এবং

মা ঐ সব অস্ত্রে সুসজ্জিতা হয়ে মহিষাসুরকে বধ করলেন। এ কাহিনী পুরাণে আছে। এভাবে ভারত নারীমূর্তিতেই শক্তির রূপ দেখেছে।

এর পরিণাম এই হয়েছে যে, ভারতে মেয়েদের মধ্যে ত নারীশক্তি এসেছেই, পুরুষদের মধ্যেও এসেছে অর্থাৎ ভারতের পুরুষ কিছু মাত্রায় নারীও। এর কারণ আছে। এদেশ কেবল 'রাম' বলে না, 'সীতারাম' বলে। কেবল 'কৃষ্ণ' নয়, 'রাধাকৃষ্ণ'। আমরা উভয়কে একত্র করে ভাবি। এর ফলে এমন এক বিচিত্র চিত্র ভারতে দেখা যায় যা জগতের অন্যত্র কোন চিত্রকর বা শিল্পী হয়ত কল্পনাও করেনি। তা হচ্ছে অর্ধনারীশ্বরের মূর্তি। জগতের অন্য কোন দেশে এরকম মূর্তি দেখা যায় না। ভারতের এই কল্পনার মধ্যে বিরাট প্রতিভা নিহিত আছে। ভারতের কবিরা এই প্রতিভাকে জানেন বলেই চিরকাল নারীর সম্মান করে এসেছেন। আমি বলছি, এ শক্তি ভারতেরই বৈশিষ্ট্য। নারীর গুণ এ দেশের নারীদের মধ্যে পুরোপুরি বিকশিত হয়েছে। এই নারীশক্তির যথাযথ ব্যবহারের পরিকল্পনা যদি গ্রহণ করা হয়, তবে ভারত তাব উদ্ধারের চাবি কাঠি পেয়ে যাবে।

সবরমতী (আহমেদাবাদ)

২১. ১২. ৫৮.

সামাজিক সাম্য

নারী ও পুরুষের মধ্যে যে ভেদ রয়েছে তা সকলেই জানে। এই ভেদ দূর করার না আছে কারুর ইচ্ছা, না আছে শক্তি। এই বাহ্যিক ভেদের আসল রূপই লোকমনে ধরা পড়েনি। বাহ্যত এ সন্তান সৃষ্টির এক সাধন মাত্র। কিন্তু এর মূলে এক পবিত্র ভাবনা রয়েছে।

মানুষ এর তাৎপর্য বুঝতে পারেনি। বস্তুতপক্ষে এ এক শাস্ত্রীয় বিষয় কিন্তু আজ তা এক লজ্জার ব্যাপারে পরিণত হয়ে গেছে। এ বিষয় নিয়ে খোলাখুলিভাবে আলাপ-আলোচনা পর্যন্ত হতে পারে না। সমাজ যখন শাস্ত্রানুসারী হবে, একমাত্র তখনই এ সম্পর্কীয় সমস্ত ভ্রান্ত ধারণা দূরীভূত হবে। বর্তমানে এ বিষয়ের যে রকম অপব্যবহার হচ্ছে, তখন তা হবে না। এই জন্যই আমি বলছি, এই বাহ্যিক ভেদ আমাদের ভুলে যাওয়া উচিত। আমাদের জীবন গড়ে তুলতে হবে একমাত্র মানবিক দৃষ্টিভঙ্গির বনিয়াদের উপর এবং আত্মিক অভিন্নতার ভিত্তিতে।

শিক্ষায় অভিন্নতা

লোকে প্রশ্ন করে, 'তা হলে আপনি কি নারী ও পুরুষের শিক্ষার ব্যাপারে কোনও প্রভেদ রাখবেন না?' আমি বলি, তেমন প্রভেদ পুরুষের শিক্ষার মধ্যেও থাকবে। পুরুষে পুরুষেও যোগ্য-অযোগ্যের ভেদ থাকে এবং সে অনুসারে তাদের বিশেষ শিক্ষা দেওয়া হয়। কিন্তু সাধারণ শিক্ষায় পার্থক্য থাকে না। নারীদের বেলাও এ রকমই হওয়া দরকার। একটি বোন প্রশ্ন করেছিলেন, 'শিশুপালন কি স্ত্রীশিক্ষার বিশেষ বিষয় নয়?' তা তো ঠিকই। কিন্তু এর অর্থ যদি এই হয় যে,

জড়-চেতন নীতির সমর্থক। সত্যিই কি পুরুষ চেতন, নারী জড়? তবে ত পুরুষ ঘড়ির মতো যে ভাবে নারীকে রাখবে সে ভাবেই সে থাকবে।

নারীর দায়িত্ব

শুরুতেই আমি স্বীকার করে নিয়েছি যে, নারীর দুর্দশার জন্যে পুরুষ অনেকাংশে দায়ী। আমি ত পুরুষের উপরই সমস্ত দায়িত্ব চাপাবার চেষ্টা করব। কিন্তু চেষ্টা করলেও তা হওয়া সম্ভব নয়। কারণ দুই চেতন বস্তুর সহযোগে যে পরিণাম হয় তার দায়িত্ব কেবল একের উপর চাপানো যায় না। আমি যদি নারী হতাম, তাহলে এখনই পুরুষদের মুক্ত করে দিতাম। বলতাম যে, সমস্ত দায়িত্ব আমার। যদি আমি জড় হতাম, নারী বা পুরুষের মতো চেতন না হতাম, তবে চুপ করে থাকতাম। কিন্তু যেহেতু আমি চেতন, সেই হেতু নিজের সমস্ত দায়িত্ব অন্যের উপর চাপানো কী করে পছন্দ করব?

ক্রান্তিকারী বৃত্তি চাই

আমি নারী হলে না জানি কত বিদ্রোহ করতাম। আমি ত চাই নারীরা বিদ্রোহ করুক। কিন্তু বিদ্রোহ ত সেই নারীই করবে যে বৈরাগ্যের প্রতিমূর্তি হবে। বৈরাগ্যবৃত্তি দৃঢ় হলে মাতৃত্বও সফল হয়। এইজন্যেই আমি মনে করি, নারীদের মধ্য থেকে শঙ্করাচার্যের মতো তেজস্বী কেউ আবির্ভূত হলে তখন তাদের উদ্ধার হবে। নারীরা যদি স্বাতন্ত্র্য চায় তবে তাদের বাসনা দ্বারা চালিত হওয়া উচিত নয়।

আমার মনে হয় শহুরে নারীদের তুলনায় গ্রাম্য নারীরা বেশী স্বাধীন। আপন বিপথগামী স্বামীর মুখে চপেটাঘাত করতে তারা ইতস্তত করে না, এমন দৃষ্টান্ত আমার চোখে পড়েছে। সে লেখা-পড়া জানা নয়, নিরক্ষরা। লেখা-পড়া জানা মেয়েদের আমি অনেক বেশী অধীন দেখতে পাই। এইজন্য

নয় যে তারা শিক্ষিতা, এইজন্য যে তারা আরাম প্রিয়। বনের বাঘ আরাম প্রিয় হয় না তাই স্বাধীন থাকে।

বিদ্রোহ করার বৃত্তি আর বিনয়ী হওয়ায় কোন বিরোধ নেই। বিনয়শীলতায় বিদ্রোহ তেজস্বী হয়। ভালো করে বুঝে নিয়ে এবং উচিত মনে করে কোন যুক্তিসঙ্গত আদেশ পালন করাকে বিনয়শীলতা বলে। অনুচিত আদেশ অমান্য করাই বিদ্রোহ, এবং তা বিনয়পূর্বক করা সম্ভব। এর মধ্যে স্বাতন্ত্র্য আছে।

একে অন্যের পরিপূরক

নারী ও পুরুষের পারস্পরিক সম্বন্ধকে বিপজ্জনক বলতে গিয়ে আগুন ও ঘিয়ের দৃষ্টান্ত দেওয়া হয়ে থাকে। কিন্তু এর বিপরীত উদাহরণও ত দেওয়া যেতে পারে। নারী ও পুরুষ একে অন্যের রক্ষক হতে পারে। নারী পুরুষকে বাচাতে পারে, আর পুরুষ নারীকে। নারী ও পুরুষ উভয়েই যাতে নিজ নিজ ত্রুটি সংশোধন করে নিয়ে পরিপূর্ণ হতে পারে প্রয়োজন তারই। অর্থাৎ পুরুষকে নারীর গুণ ও নারীকে পুরুষের গুণ আয়ত্ত করে উভয়কেই পরিপূর্ণ হতে হবে।

পূর্ণতা অর্জনের পদ্ধতিই এই রকম। এতে পুরুষকে নারী আর নারীকে পুরুষ হতে হয়। শ্রমিককে হতে হয় শিক্ষিত আর শিক্ষিতকে শ্রমিক। আমাদের এখানে বিদ্বান লোকেদের রান্নাঘরে কাজ করতে দেখে কেউ কেউ বলছিলেন, 'এমন সব পণ্ডিত ব্যক্তিদের আপনি রান্নার কাজে কেন নিয়োগ করেন?' আমি বললাম, 'ভাই, আমি কি করতে পারি? বিদ্বান ত এরা নিশ্চয়ই, কিন্তু এদেরও যে ক্ষুধা পায়। তা না হলে এদের আমি রান্না করতে পাঠাতাম না।' নারীদের পক্ষে রান্নার কাজ স্বাভাবিক। যাদের কাছে তা সহজ নয়, তাদের তা অভ্যাস করা দরকার। আর এই ভাবেই পরিপূর্ণ হতে হয়।

অহিংসার অগ্রদূত হও

বোনেরা যখন আমাকে প্রশ্ন করেন, 'আমরা কীভাবে আত্মরক্ষা করতে পারি', তখন আমি বলি, 'এতে আপনাদের ভাববার মতো কিছুই নেই। আমাদের ত নারী ও পুরুষ ভেদ কল্পনা না করে উভয়কে পরিপূর্ণ করে তুলতে হবে। কাজেই আপনারা এই বিশ্বাস ও শ্রদ্ধা হৃদয়ে পোষণ করুন যে, সব সময় সমর্থ না হলেও, স্বাভাবিক ভাবেই যেমন পুরুষেরা নিজেদের রক্ষা করতে সক্ষম বলে মনে করে, তেমন আপনারাও আপনাদের স্বয়ং রক্ষা করতে পারবেন।' তাতে বোনেরা বলেন, 'পুরুষের হাতে ত অস্ত্র থাকে।' উত্তরে আমি বলি, 'একমাত্র এটাই যদি আপনাদের অভাব হয়ে থাকে, তবে, আপনারাও অস্ত্র রাখতে পারেন। যাতে পুরুষদের অধিকার আছে, তাতে আপনাদেরও অবশ্যই অধিকার থাকা চাই। কিন্তু যে কোনও অবস্থায় আপনাদের নির্ভীক হতে হবে। আমি একথা বিশ্বাস করি না যে, অস্ত্র থেকে নির্ভয়তা আসতে পারে। তবে একথা আলাদা যে, নির্ভীক ব্যক্তির হাতে অস্ত্রও কাজে আসে। কিন্তু যিনি বিশ্বাস করেন যে, হাতে অস্ত্র থাকলে শক্তি বাড়ে এবং যদি মনে করেন যে অস্ত্রের উপর নির্ভর করেই সমাজের চলা উচিত, তাহলে পাশ্চাত্য দেশের মতো এদেশেও নারী-পুরুষ উভয়ের জন্যই সে পথ খোলা রাখতে হবে। অহিংসার কাজে নারীরা অগ্রণী হতে পারেন। কিন্তু তাঁরা যদি নিজেদের অক্ষম বলে মনে করেন তাহলেও নারী-পুরুষের মধ্যে পার্থক্য করা কিছুতেই ঠিক হবে না।

ভাষা সংশোধন কর

আমি ত ভাষার মধ্যেও নারী-পুরুষের ভেদ রাখতে চাই না। হিন্দী, মারাঠী ইত্যাদি ভাষায় এ এক অর্থহীন ভেদের সৃষ্টি হয়েছে দেখতে পাই। প্রতিটি কথায় আমরা প্রকাশ করে থাকি 'আমি পুরুষ', 'আমি পুরুষ'; 'আমি নারী,' 'আমি নারী'। উভয়ে যদি 'যাওয়া'-র কাজেই থাকে, তাহলে ক্রিয়া ত

একই হবে। কিন্তু পুরুষ বলবে—মৈঁ গয়া (আমি গিয়েছিলাম) : আর নারী বলবে—মৈঁ গয়ী (আমি গিয়েছিলাম)। এ সবের কী প্রয়োজন? জীবনে যে কৃত্রিমতা এসে গেছে এ সব তারই লক্ষণ। সে যাই হোক এ সবেরও সংস্কার করতে হবে। এ হাওয়ার কথা নয়, আমি একেবারে এই মাটির কথা বলছি। যেখানে নারী ও পুরুষের সামনা-সামনি কথা বলার রেওয়াজ আছে সেখানে বিধিসম্মত ভাষায় লিঙ্গভেদ থাকলেও ব্যবহারিক ক্ষেত্রে তা লোপ পেয়ে যায়। যেমন, মহারাষ্ট্রে মেয়েরাও ছেলেদের মতো—'মী জাত আহে' (আমি যাচ্ছি) বলে।

উপসংহারে আমার বক্তব্য এই যে, বোনেদের প্রত্যেকের আত্মনিষ্ঠ হতে হবে। এখানে 'নির্ভয়' শব্দও আমার তেমন পছন্দ হয় না। তার মধ্যেও যেন আমি 'ভয়ে'র গন্ধ পাই। ভয়ের সঙ্গে যার পরিচয় নেই এমন বালক নির্ভয় শব্দের অর্থ বুঝবে না। এই জন্যই আমি 'আত্মনিষ্ঠ' শব্দ ব্যবহার করছি। আপনাদের মধ্যে আত্মনিষ্ঠা বৃদ্ধি পাক, এই আমার প্রার্থনা।

'মহিলা-আশ্রম' পত্রিকা,
নভেম্বর, ১৯৪৬

লুণ্ঠনকারী পুরুষ

ওয়ার্ধায় আমাদের লোকেরা সাফাই-এর কাজ করতে যায়। আমি দেখেছি যে. পায়খানা পরিষ্কার করার আসল কাজ মেথরাণীরাই করে। প্রয়োজনীয় জিনিস-পত্রের অভাবে নোংরা পায়খানার ময়লা তারা হাত দিয়ে পরিষ্কার করে। তারাই তা ড্রামে ভরে এবং ভর্তি ড্রাম মাথায় চাপিয়ে গাড়ীতে নিয়ে ঢালে। পুরুষ মেথরেরা কেবল ময়লা ভর্তি গাড়ী খালি করে দেওয়ার জন্যে নিয়ে যায়, অর্থাৎ এখানেও পুরুষেরা নারীদের শোষণ করছে।

পুরুষের অপমান বোধ

পক্ষান্তরে মেয়েদের কোন কাজ করে দিতে গেলেও আমরা পুরুষেরা অপমান বোধ করি। অথচ ব্যাকরণের নিয়ম অনুসারে যারা পুংলিঙ্গের পর্যায়ে পড়ে তাদের একজনও নিজের কাপড় নিজে কাচে না। বাবার কাপড় মেয়ে কাচে, ভাইয়ের কাপড় বোন। এমন কি মার কাপড় কেচে দিতে হলেও আমাদের কেমন যেন সরম আসে। যদি স্ত্রীর কাপড় ধুয়ে দেওয়ার প্রয়োজন হয়, তখন? তেমন বেয়াড়া অবস্থায় পড়লে কোন আত্মীয়া কাপড় ধুয়ে দেন। যদি আত্মীয়া না জোটে তবে কোন প্রতিবেশিনী তা করে দেন। যদি প্রতিবেশিনীও না পাওয়া যায় এবং শাড়ী নেহাৎ কাচতেই হয়, তাহলে সন্ধ্যার অন্ধকারে কেউ না দেখে সেদিকে সজাগ দৃষ্টি রেখে চোরের মতো কাজ শেষ করতে হয়। অবস্থা তো এই!

জামালপুর,
২২, ১০, ৫৩

পুরুষপ্রধান সমাজ

নারী-পুরুষের এই যে বৈষম্য তা কখনো টিকে থাকতে পারে না। নারী-পুরুষের সম্বন্ধকে আজ আমরা কৃত্রিম করে তুলেছি। নারীদের রক্ষিত করেছি আর আমরা হয়েছি রক্ষক। এ ভুল। সমাজে নারী কেবল সুরক্ষিত নয় বরং তাকে স্বরক্ষিত হতে হবে। বনে বাঘিনীকে বাঘ রক্ষা করে না, বাঘিনী নিজেই নিজেকে রক্ষা করে। কাজেই নারীকে রক্ষিত মনে করা ভুল। আমরা গৃহ-সাধন, ভোগ-সাধন প্রভৃতি যে নামই দিই আসলে তাকে জড়পদার্থ বলেই মনে করি। একজন ত এ পর্যন্ত বলেছিলেন, পুরুষ আত্মা আর নারী প্রকৃতি! আমি বললাম, 'দার্শনিক ভাষা ছেড়ে দিয়ে একটু চিন্তা কর। পুরুষ ত আত্মতত্ত্ব। এ আত্মার কোন লিঙ্গ হয় না। তা নারী-পুরুষ উভয়ের মধ্যে রয়েছে। প্রকৃতি জড়তত্ত্ব। তাও নারী ও পুরুষ উভয়ের

মধ্যে আছে। পুরুষ ও প্রকৃতি এই দুই তত্ত্ব নারী-পুরুষ উভয়ের মধ্যেই বিদ্যমান। পুরুষের মধ্যে পুরুষ-তত্ত্ব বেশী আর নারীর মধ্যে প্রকৃতি-তত্ত্ব বেশী এরকম মনে করা ভুল। আমরা সুবিধা মতো ঠিক করে নিয়েছি যে, নারীদের স্বাধীনতা দেব না। পুরুষদের রক্ষণাবেক্ষণে তাদের থাকতে হবে। কোন কোন সমাজের অবস্থা এমন দাঁড়িয়েছে যে, সেখানে ছেলে হলে খুশী হয় আর মেয়ে হলে দুঃখিত হয়। ছেলে হলে যেন স্বর্গ নেমে এল এরকমও মনে করে! এসবই ভুল ধারণা এবং ইচ্ছে করেই তা ছড়ানো হয়েছে যাতে সমাজে পুরুষের প্রাধান্য চিরকাল বজায় থাকে। আমার বলার মধ্যে হয়ত একটু কঠোরতা এসে গিয়ে থাকবে, কিন্তু কথাটা সত্য।

পুরাকালে কী অত্যাচারই না নারীদের উপর করা হয়েছে। দ্রৌপদীকে আক্রমণ করা হল। সীতাকে রাবণ হরণ করে নিয়ে গেল। অর্থাৎ নারীদের স্বাধীনতা দেওয়া হয়নি। আমরা যতদূর সম্ভব তাদের সুরক্ষিত রেখেছি। যেখানে সুরক্ষিত রাখতে পারিনি সেখানে লজ্জিত হয়েছি; কিন্তু তাদের স্বরক্ষিত হতে দিই নি। আমাদের এই বৈষম্য দূর করা চাই।

মধিপুরা (সহর্ষা)
১৪. ১২. ৫১

'মহিলা' থেকে 'অবলা'

এই সম্মেলনেও পুরুষ অপেক্ষা নারীর সংখ্যা অনেক কম দেখা যাচ্ছে। এ রকম পার্থক্যের কারণ কি? ভগবান ত পুরুষ অপেক্ষা নারী কম সৃষ্টি করেননি। কিন্তু আজ সমস্ত পরিকল্পনা ও কাজ পুরুষদের হাতে, তাই নারীদের যথাসম্ভব কম স্থান দেওয়া হয়ে থাকে। বলা হয় যে, প্রত্যেক কমিটিতে এক-আধজন নারীর স্থান থাকা উচিত। এ যেন সংখ্যালঘু দল থেকে প্রতিনিধি নেওয়ার মতো নারীদেরও প্রতিনিধি নেওয়া। কিন্তু তবু নারীরা জেগে উঠছে না। কারণ যে শিক্ষা পুরুষদের অপ্রকৃতিস্থ করেছে, সে

শিক্ষাই নারীদেরও দেওয়া হচ্ছে। নারীদেরও আধ্যাত্মিক জ্ঞান লাভ করা দরকার। কিন্তু আজকাল তা হয় না। এ অবস্থায় দুনিয়াকে কে বাঁচাবে? ভারতীয় মহিলাদের এ ব্যাপারে অগ্রণী হতে হবে। 'মহিলা'র মতো নারীর মহিমা ব্যঞ্জক শব্দ কি অন্য কোনো ভাষায় আছে? 'মহিলা' শব্দই মহত্ত্বসূচক। কিন্তু মাঝখানে এমন এক যুগ এল যখন নারীদের 'অবলা' বলা হত। 'মহিলা' গেল আর 'অবলা' এল।

সর্বোদয়-সম্মেলন, পণ্ঢরপুর,
৩১. ৫. ৫৮

পর্দাপ্রথা

আমি তখন দক্ষিণ তেলেংগানায় ঘুরছিলাম। দেখেছি সভায় পুরুষেরা যত আসত মেয়েরাও তত আসত। এমন কি মেয়েরা নির্ভয়ে সভায় দাঁড়িয়ে আমাকে প্রশ্ন করত। কিন্তু সেখানে মুসলমানদের রাজত্ব ছিল বলে মুসলমান রাজাদের খুশী করার জন্য হিন্দুরাও পর্দার রেওয়াজ নিজেদের মধ্যে চালু করেছিল। অন্যের ভালো রীতিকে গ্রহণ করার মধ্যে কোন দোষ থাকতে পারে না! কিন্তু পর্দার রেওয়াজ ত মোটেই ভালো নয়। বোনেদের পর্দার আড়ালে রাখা কীরকম আক্কেলের কথা? সমাজ যদি এভাবে চলতে থাকে, তবে যে স্বাধীনতা পাওয়া গেছে তা টিকবে না।

এখন মুসলমানদেরও পর্দা ছাড়তে হবে। আজমীরের দরগাশরীফ-এ মুসলমানদের এক সভায় আমি বলেছিলাম, 'আল্লার মসজিদেও নারী-পুরুষের ভেদ কেন? এই সভায় মেয়েদের কেউ উপস্থিত আছেন বলে ত দেখছি না। পর্দা আপনাদের ছেড়ে দিতেই হবে। যে সমাজে নারীরা পর্দার আড়ালে থাকে, সে সমাজ কখনও উন্নত হতে পারে না।' তাঁরা আমার কথা প্রেমের সঙ্গে শুনেছেন, কারণ এতে সত্য ছিল।

নারীদের পুরুষীকরণ বিপজ্জনক

আজ পুরুষেরা যেসব কাজকারবার চালাচ্ছে তা ঠিক ভাবে চলছে না। আজকাল ত পুরুষদের অহিংসা শেখাবার পরিবর্তে নারীদেরও সমদৃষ্টির নামে সেনাদলে ভর্তি করা হচ্ছে। অর্থাৎ নারীদের মধ্যে পুরুষীকরণ প্রচলন করা হয়েছে। কিন্তু পুরুষেরা যে সংহারের কাজ আরম্ভ করেছে তাতে যখন নারীরাও যোগ দিতে শুরু করবে তখন বিশ্বকে বাঁচাবে কে? সমুদ্র যদি গঙ্গাকে স্থান না দেয় তবে সে যাবে কোথায়? জগৎ পালনের শক্তি যাঁদের মধ্যে রয়েছে সেই নারীরাই যখন কাঁধে বন্দুক রাখতে আরম্ভ করবে তখন সংসারকে কে বাঁচাবে? পুরুষ টাইপিষ্ট হয় বলে নারীরাও যদি টাইপিষ্ট হয়, তবে তার মধ্যে কোন সারবস্তু থাকে না। অহিংসাশক্তির বিকাশ সাধন করে নারীদের জগত রক্ষার পরাক্রম দেখাতে হবে।

নারীরা স্বরক্ষিত হোক

সুরক্ষিত নয়, নারীদের স্বরক্ষিত হতে হবে। ছোটো ছোটো শিশুরা সুরক্ষিত থাকবে, কিন্তু নারীদের পুরুষের মতো স্বরক্ষিত হতে হবে। একথা বলা মিথ্যা যে, নারীদের মধ্যে রক্ষণ-সামর্থ্য নেই। বিজ্ঞান তা বলে না। বিজ্ঞান বলে যে, পুরুষ অপেক্ষা নারীদের শরীর অধিক রক্ষণ-সমর্থ। রোগীর সেবা-শুশ্রূষা করতে গিয়ে পুরুষকে যদি দু তিনমাস জেগে থাকতে হয় তাহলে সে নিজেই অসুস্থ হয়ে পড়ে। কিন্তু মেয়েরা সেবা ও ঘরের সব কাজ করেও ঠিক থাকে। এর অর্থ হচ্ছে তাদের দেহে অবস্থার সঙ্গে মানিয়ে চলার শক্তি বেশী।

হিরাপুর (বোম্বাই রাজ্য),
৮. ৭. ৫৮

এখনো অন্দরবন্দিনী

অন্যান্য দেশে ভাই-বোনেরা এক সঙ্গে কাজ করে। যদি তারা তা না করে, তবে শক্তি আধা থেকে যাবে। এ ভাবে অর্ধশক্তি দিয়ে কতদিন কাজ চলতে পারে? এখন ত ইরাক, মিশর প্রভৃতি দেশেও পর্দাপ্রথা উঠে গেছে। সে সব দেশের বোনেরা বাইরে এসে কাজ করে। আপনারা ত জানেনই যে কংগ্রেসের বর্তমান সভাপতি কে? যেখানে শ্রীমতী ইন্দিরা প্রধান, সেখানে কি বোনেরা অন্দরমহলেই থেকে যাবেন?

আপনারা নাটক, সিনেমা ইত্যাদি দেখতে বোনেদের সঙ্গে নিয়ে যান। কিন্তু বিনোবার কথা শোনার সময় তাদের সঙ্গে আনেন না। এ কী রকম বুদ্ধি? নাটক, সিনেমায় তাদের না নিলে তা বোঝা যায়। কিন্তু জ্ঞানের কথা শোনার জন্যে সঙ্গে না নিয়ে এলে তা কি করে মানা সম্ভব? আপনারা এখন বোনেদের এগিয়ে আসতে দিন। আপনাদের ডান দিকে কাশ্মীর। আমি কিছু দিন হল সেখান থেকে এসেছি। কাশ্মীরে আমি দুটি নাম শুনেছি—আল্লা ও লল্লা। লল্লা নামে এক মহীয়সী নারী ৭০০ বছর আগে জন্মগ্রহণ করেছিলেন। তিনি শৈব-ধর্মাবলম্বী হিন্দু ছিলেন। ভক্তিমূলক যে সব ভজন তিনি লিখেছিলেন, তা আজও হিন্দু-মুসলমান নির্বিশেষে সবাই সানন্দে গান করেন। অন্যদিকে আপনাদের বাঁয়ে রাজস্থান। রাজস্থানে মীরার নাম প্রসিদ্ধ। মীরার ভজনও ঘরে-ঘরে গীত হয়। আপনারা রাজস্থান ও কাশ্মীরের মাঝখানে। এখানকার বোনেরা কি ভক্তি ও জ্ঞানে পিছিয়ে থাকবে?

মমরোট (পাঞ্জাব)
২১. ১১. ৫৯

সম্পত্তিতে নারীর অধিকার

মোক্ষ কি বোনের জন্য কম আর ভাইয়ের জন্য বেশী দরকার? রামচন্দ্রের প্রেম ভরতের উপর যতখানি ছিল শবরীর উপরও ততখানিই ছিল। কিন্তু আজ

সমাজের অবস্থা এমন দাঁড়িয়েছে যে মেয়ে হলে আত্মীয় পরিজন দুঃখে ম্রিয়মাণ হয়ে পড়ে। আমি বলি, আপনার মা-ও প্রথমে মেয়েই ছিলেন। যদি কেবল ছেলেই হয়, মেয়ে না হয়, তাতে কি আপনারা খুশী হবেন? যদি না হন, মা ও বাবার মূল্য সমান বলে মনে করেন, তবে ছেলের কদর বেশী এবং মেয়ের কদর কম কেন? ছেলেরা সম্পত্তির অধিকারী হয়, শিক্ষা পায়; কিন্তু মেয়েদের সম্পত্তি পাওয়ার অধিকার নেই, তারা শিক্ষাও পায় না। বলা হয়ে থাকে যে, বাবার ঘরে মেয়েদের কোন অধিকার নেই। যখন তারা স্বামীর ঘরে যাবে, তখন সেখানে অধিকার পাবে। বিয়ে না হলে মেয়ের ভাগ্য বাবার দয়ার উপর নির্ভর করে।

আজকাল ত এরকম কথাও বলা হয় যে, ভাই-বোন দুজনকেই যদি সম্পত্তির অধিকার দেওয়া হয় তবে তাদের প্রেমভাব নষ্ট হয়ে যাবে। তা ত ভাইদের বেলাও হবে। তাহলে এমন ব্যবস্থা করা হোক যাতে বাবা মারা গেলে সমস্ত সম্পত্তিই সমাজের হাতে চলে যায়। আবার বলা হয়ে থাকে, মেয়ে যদি উত্তরাধিকারী হয় তবে ধর্মের উপর আক্রমণ করা হবে। একটু দক্ষিণে যদি যান তাহলে সেখানে নারীপ্রধান সমাজ দেখতে পাবেন। বাবার ঘরে মেয়ের অধিকার নেই—একথা যদি সত্য হয়, তবে বাবার গুণ মেয়ের মধ্যে বিকাশ লাভ করত না। আমি এমন অনেক মেয়ে দেখেছি যাদের মধ্যে বাবার রূপ প্রকাশ পেয়েছে। মেয়েরা বাবার আকৃতি পায়, গুণ পায়। এই অবস্থায় তাদের অধিকার না দেওয়ার কি অর্থ হয়? আসল কথা হচ্ছে পুরুষ সমস্ত সম্পত্তি নিজের হাতে এবং নারীকে তার অধীন রাখতে চায় এবং বলে যে নারীকে অধীনে রাখা খুবই দরকার। এসব বলার জন্য ঐসব লোক আবার ধর্মের সাহায্য নেয়। আমি বলি, 'ভালো চাও ত ওসব বই জলে ফেলে দাও।'

টিকাপট্টি (পূর্ণিয়া)

২০. ১১ ৫৫

বিবাহ-বিচ্ছেদ

স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে যদি অন্যায়, অনাচার, অত্যাচার এবং বিদ্বেষ চলতে থাকে তবে ছেলেপুলেরা কষ্ট পায়। এই অবস্থায় বিবাহ-বিচ্ছেদ হলে কোন ক্ষতি নেই। সমস্ত ধর্ম নিজেদের ইচ্ছার উপর দাঁড়িয়ে আছে, আইনের উপর নয়। ধর্ম আজ্ঞা দেয় না, অনুজ্ঞা দেয়। তাই বিশেষ পরিস্থিতিতে বিবাহ-বিচ্ছেদের অধিকার দেওয়া উচিতই হবে। কিন্তু কেউ যদি বলে, 'এতে অনেক বিবাহ-বিচ্ছেদ হতে থাকবে', তবে তা মেনে নেওয়া ধর্মের দিক থেকে ঠিক নয়। হাঁ, বিবাহ-বিচ্ছেদের জন্য অবশ্যই কিছু কারণ থাকা চাই। মূল বিচারগুলি বজায় রেখে উদারতার সঙ্গে বিবাহ-বিচ্ছেদকে স্বীকৃতি দিতে হবে।

পুনপুন (পাটনা)
২৬. ১০, ৫২

আধ্যাত্মিক অধিকার

গৃহপালনের কাজ নারীদের নিজস্ব কাজ, এ দৈবের বিধান। তা প্রগতিশীল আমেরিকার বেলায় যেমন সত্য পশ্চাৎপদ ভারতের বেলাও তেমনই সত্য। কিন্তু আসল প্রশ্ন কোথায় আটকা পড়ে আছে তার সঠিক বিচার আজ পর্যন্ত হয়নি। হিন্দুধর্মে কোন-কোন ব্যাপারে নারীদের অনুপযুক্ত বলে ধরা হয়েছে। ভূসম্পত্তিতে নারীদের অধিকার নেই। কিন্তু এ বিষয়ে পুরুষদের যেমন তাদেরও তেমন সমান অধিকার পাওয়া চাই। আমি এ সম্বন্ধে সম্পূর্ণ সহানুভূতিশীল। হিন্দুকোড বিল ভালো একথা আমি দিল্লীযাত্রার সময়ই বলেছিলাম। বিগত সাধারণ নির্বাচনে সনাতনপন্থীরা হিন্দুকোড বিল নিয়ে নেহরুকে উত্তেজিত করে দিয়েছিলেন। তিনি তখন বলেছিলেন, 'এ বিষয়ে বিনোবাজীকে জিজ্ঞেস করুন, কারণ শাস্ত্র সম্বন্ধে তাঁর বিশেষ জ্ঞান আছে। তিনি ত এর অনুকূলে।' কিন্তু প্রকৃতপক্ষে যে-সমানাধিকারের প্রয়োজনীয়তা নারীদের রয়েছে তা কেউ দাবি করছেন না।

হিন্দুধর্ম নারীদের সন্ন্যাস ও ব্রহ্মচর্যের অধিকার দেয়নি। অধিকার দিলেই যে শত-শত নারী সন্ন্যাসিনী হয়ে যাবেন তা নয়। কথা হচ্ছে আধ্যাত্মিক অযোগ্যতা রয়েছে বলে নারীদের মধ্যে স্থায়ীভাবে একটা হীনতার ভাব এসে গেছে। এ অবস্থা ঢাকার জন্য হিন্দু সমাজ গৃহস্থাশ্রমের উপর মহত্ত্ব আরোপ করে এক শাস্ত্র সৃষ্টি করেছে। তা হচ্ছে এই—'সহস্রং তু পিতৄন্ মাতা গৌরবেণাতিরিচ্যতে', অর্থাৎ সহস্র পিতা অপেক্ষা এক মাতা শ্রেষ্ঠ। যে মনুস্মৃতি থেকে এই বচনটি নেওয়া হয়েছে তাতে আরেকটি শ্লোক আছে এইরকম—

পিতা রক্ষতি কৌমারে, ভর্তা রক্ষতি যৌবনে।
পুত্রো রক্ষতি বার্ধক্যে ন স্ত্রী স্বাতন্ত্র্যমর্হতি॥

ঐতিহাসিক দৃষ্টি থেকে এ শ্লোকটিকে কোন প্রক্ষিপ্ত বা পরে সংযোজিত অংশও বলা যেতে পারে। এমনও হতে পারে যে এসব এক লেখকের রচনা নয়, তবুও তা একই পুস্তকে স্থান পেয়েছে আর হিন্দুধর্ম সেই পুস্তককে মাথায় করে রেখেছে।

বাবার সম্পত্তিতে মেয়েদের স্বত্ব থাকা উচিত নয় এরকম মত যাঁরা পোষণ করেন তাঁদের যুক্তি হচ্ছে মেয়েদের দুদিক থেকে পাওয়ার সুযোগ কেন থাকবে। বিয়ের পর স্বামীর পক্ষ থেকে কিছু-না কিছু ত তারা পাবেই। অর্থাৎ অন্তত দুইএক জনও যে অবিবাহিত থাকতে পারে এমন অবস্থাও কেউ মেনে নিতে প্রস্তুত নন। তাঁরা মনে করেন যে, মেয়েদের ত এখান থেকে ওখানে যেতেই হবে। এর অর্থ এই দাঁড়ায় যে, নারীদের কেবল গৃহস্থাশ্রমেরই অধিকার ছিল, অন্য আশ্রমের অধিকার ছিল না। প্রাচীন ব্রাহ্মণগ্রন্থে বলা হয়েছে 'দুহিতা পণ্ডিতা জায়েৎ', অর্থাৎ কেউ যদি চান যে তাঁর মেয়ে পণ্ডিত হোক, তবে তাঁকে অমুক-অমুক কাজ করতে হবে। এখন দেখা যাক শংকরাচার্য তাঁর শংকরভাষ্যে এর অর্থ কি করেছেন। যে শংকরাচার্যের প্রতি আমার আপাদমস্তক শ্রদ্ধায় অবনত, তিনি এর

অর্থ করেছেন 'পণ্ডিতা গৃহকার্য-কুশলা ইত্যর্থঃ।' পণ্ডিতা অর্থাৎ গৃহকর্মে কুশল। তিনি কল্পনাও করতে পারেননি যে, মেয়েরা এ ছাড়া অন্য বিষয়েও পণ্ডিত হতে পারে। মেয়েরা সন্ন্যাসিনী হবে এ কল্পনাও তিনি করতে পারতেন না। এজন্যেই তিনি ঐরকম অর্থ করেছেন। মেয়েদের গৃহকর্মে কুশল হওয়া সম্বন্ধে আমার যে কোন আপত্তি আছে তা নয়। তাদের গৃহকর্মে কুশল না হওয়াতে দেশের কোন লাভ হবে না। কিন্তু গৃহকর্ম-কুশলতার মধ্যেই যদি তাদের পাণ্ডিত্যের পরিসমাপ্তি ঘটে, তবে তা ঠিক হবে না। এই যে আধ্যাত্মিক অনধিকারের বোঝা এক সময় নারী ও শূদ্রদের উপর চাপিয়ে দেয়া হয়েছিল, তা থেকে তাদের মুক্ত করতে হবে।

ছেলেবেলায় মা আমাকে একটি মজার গল্প শোনাতেন। 'বিন্যা, শিশুর জন্ম হওয়া যে কত কঠিন তা তোর পক্ষে জানা সম্ভব নয়। প্রথমে এ কাজের ভার শংকরের উপর ছিল। পরে তিনি ক্লান্ত হয়ে চারদিনের জন্যে সে কাজের ভার পার্বতীকে দিলেন। তখন থেকে এ কাজের দায়িত্ব পার্বতীর উপরই থেকে গেল, শংকর আর তা ফিরিয়ে নিলেন না।' এভাবে যখন নারীদের উপর এক কাজের ভার এসে গেছে তখন তাদের গৃহকাযে যে অভিজ্ঞ হতেই হবে, এতে সন্দেহ নেই। কিন্তু তাদের উপর যে আধ্যাত্মিক অনধিকার চাপিয়ে দেওয়া হয়েছে, তা অবশ্যই তুলে নিতে হবে। বিধান-সভায় আইন তৈরি করে তা হবে না। তাই আমি প্রায়ই বলি, শংকরাচার্যের মতো তপস্বী, জ্ঞানী ও বৈরাগ্যসম্পন্ন কোন নারীর আবির্ভাব না হলে নারীজাতির উদ্ধার হবে না।

হিরাপুর (বোম্বাই)
৮. ৭. ৫৮

নারীজাতির উদ্ধার

ভারতবর্ষের নারীজাতির নিজস্ব একটা স্থান আছে আর তার ইতিহাসও আছে। তা সাধারণত নারী ও পুরুষের সম্মিলিত ইতিহাসই। তাহলেও এদেশে নারীজাতির এক আলাদা ইতিহাস রয়েছে। ভারতে প্রাচীনকাল থেকে সংস্কারের পরম্পরা চলে আসছে, যা কমপক্ষে দশ হাজার বছরের পুরানো ত বটেই। এর ইতিহাস পাওয়া যায়। তবে ইতিহাস যেমন বিশেষভাবে লেখা হয়ে থাকে এ সেরকম নয়। কিন্তু এর ইতিহাস ভালোভাবে পাওয়া যায় হাজার-হাজার গ্রন্থে, পুঁথিতে।

নারীজাতির উদ্ধারক

ভারতে নারীজাতির উদ্ধারের জন্য যাঁরা প্রচেষ্টা করেছেন তাঁদের মধ্যে প্রাচীন যুগে শ্রীকৃষ্ণ ও বুদ্ধের নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য, আধুনিক যুগে উল্লেখযোগ্য গান্ধীজীর নাম। মধ্যবর্তীকালে একেবারে যে কোন কাজ হয়নি তা নয়। তারও এক ইতিহাস আছে। কিন্তু এ তিনটি নাম কিছুতেই ভোলা যায় না।

ভগবান শ্রীকৃষ্ণ

ভগবান শ্রীকৃষ্ণ নারীজাতির জন্য যা কিছু করেছেন তা আজ পাঁচ হাজার বছর ধরে কীর্তিত হয়ে আসছে। দ্রৌপদী যখন এক বিপদের সম্মুখীন, যখন সভামধ্যে তাঁর বস্ত্রহরণ হচ্ছিল, তখন তিনি শ্রীকৃষ্ণকে স্মরণ করলেন। এ সম্বন্ধে তিনটি শ্লোক আছে। বলা হয়ে থাকে ঐ শ্লোক তিনটি মানুষকে সংসার সমুদ্র থেকে উত্তীর্ণ করে দেওয়ার সামর্থ্য রাখে। গান্ধীজী

আশ্রমে যে প্রার্থনার প্রবর্তন করেছেন এই শ্লোক তিনটিও তাতে স্থান পেয়েছে। ভগবান শ্রীকৃষ্ণের নাম স্মরণ করে দ্রৌপদী প্রার্থনা করেছিলেন, 'যখন আমার স্বামী পরাজিত, ভাইরা দর্শকমাত্র, ভীষ্ম-দ্রোণও পরাস্ত তখন এই বিপদে তুমি ছাড়া আমাকে আর কে রক্ষা করবে?' শ্লোকটিতে ভগবানকে যেসব বিশেষ বিশেষ নামে সম্বোধন করা হয়েছে তার মধ্যে 'গোপীজনপ্রিয় কৃষ্ণ' অন্যতম। অর্থাৎ 'হে কৃষ্ণ, তুমি যিনি গোপীজনের প্রিয়, যাঁর উপর গোপীদের প্রেম ছিল আর গোপীদের প্রতি যাঁর প্রেম ছিল, সেই তুমি আমাকে রক্ষা করার জন্য এসো।' দ্রৌপদী এই প্রার্থনা করেছিলেন। সমগ্র ভাগবত এই এক কথার উপর দাঁড়িয়ে আছে। গোপীদের প্রতি শ্রীকৃষ্ণের যে প্রেম ছিল, নারীদের জন্য তাঁর মনে যে শ্রদ্ধা ছিল আর বন্ধুর মতো তাঁদের জন্য তিনি যে কাজ করতেন, তা ভারতের ইতিহাসে অদ্বিতীয়। শুনতে ও পড়তে শ্রীকৃষ্ণ-গাথার মতো মধুর গাথা ভারতে আর একটিও নেই।

মহাবীর ও বুদ্ধ

মহাবীরের ইতিহাস এক অদ্ভুত ইতিহাস। মহাবীর যে যুগে জন্মেছিলেন তার চল্লিশ বছর পর গৌতম বুদ্ধের আবির্ভাব হয়। মনে করুন আজকের বংশধরদের সঙ্গে লোকমান্যের যুগের যেমন ব্যবধান ছিল তেমন। দুজনেরই জন্ম হয়েছিল বিহার প্রদেশে। হতে পারে মহাবীরকে বুদ্ধ হয়ত দেখেছিলেন। তাহলে তখন মহাবীর ছিলেন বৃদ্ধ এবং বুদ্ধ যুবক। এরকম প্রমাণও আছে। মহাবীর সম্প্রদায়ে নারী-পুরুষের মধ্যে কোনরকমের ভেদ করা হয়নি। পুরুষদের যে অধিকার দেওয়া হয়েছিল, নারীদেরও সেই অধিকার দেওয়া হয়েছিল। আজকাল যেসব অধিকারের কথা নিয়ে প্রচুর আলোচনা হয়ে থাকে আমি সেসব মামুলী অধিকারের কথা বলছি না। সেইযুগে এ ধরনের অধিকার অর্জন করার আবশ্যকতাই হয়ত কেউ অনুভব করেনি।

আমি বলছি আধ্যাত্মিক অধিকারের কথা। পুরুষের যে আধ্যাত্মিক অধিকার আছে, নারীরও সে অধিকার থাকতে পারে। এসব আধ্যাত্মিক অধিকারের ক্ষেত্রে মহাবীর কোনও ভেদ-বুদ্ধির প্রশ্রয় দেননি। পরিণামস্বরূপ দেখা যায় যে, তাঁর শিষ্যদের মধ্যে শ্রমণ অপেক্ষা শ্রমণীর সংখ্যা ছিল বেশী। জৈনধর্মে আজ পর্যন্ত ঐ প্রথা চলে আসছে। জৈন রমণীরা (সাধ্বীরা) আজও সন্ন্যাসিনী হন। জৈন ধর্মে নিয়ম আছে যে, সন্ন্যাসী একা ভ্রমণ করতে পারবেন না। সন্ন্যাসী ও সন্ন্যাসিনীদের জন্য নিয়ম আছে যে, ভ্রমণের সময় তাঁদের সংখ্যা দু'জনের বেশী বা কম হবে না। তাই ভারতে সাধ্বীদের দুজন দুজন করে একসঙ্গে ভ্রমণরতা দেখা যায়।

মহাবীরের চল্লিশ বছর পর গৌতম বুদ্ধের জন্ম হয়েছিল এবং বুদ্ধ নারীদের সন্ন্যাস গ্রহণের অধিকার দেওয়া উচিত নয় বলে মনে করেছিলেন। নারীদের সন্ন্যাস দিলে ধর্মের মর্যাদা বজায় থাকবে না—এই ছিল তাঁর আশঙ্কা। একদিন শিষ্য আনন্দ এক ভগ্নীকে ভগবান বুদ্ধের কাছে এনে তাঁকে বললেন—"আমি বিচার করে দেখেছি এই বোন সবদিক থেকে আপনার উপদেশ লাভের যোগ্যা। এঁকে আপনার উপদেশ, অর্থাৎ সন্ন্যাসের উপদেশ দিতে হবে।" তখন বুদ্ধ ভগবান মেয়েটিকে দীক্ষা দিয়ে বললেন, 'আনন্দ তোমার আগ্রহ ও প্রেমের জন্য আমাকে এ কাজ করতে হল। কিন্তু এর দ্বারা আমি সম্প্রদায়ের উপর এক বিরাট বিপদের বোঝা তুলে দেওয়ার ঝুঁকি নিলাম।' এই কথা কয়টি থেকে বুদ্ধদেবের যে আশঙ্কা ছিল তা বোঝা যায়। বৌদ্ধধর্মের ইতিহাস বিরাট ইতিহাস। এতে কিছু দোষ থাকলেও বৌদ্ধধর্মের জন্য দেশ গর্ব অনুভব করতে পারে। কিন্তু এ দেখে আশ্চর্য লাগে যে, বুদ্ধদেবের যে ভয় ছিল মহাবীরের তা ছিল না। মহাবীরের নির্ভীকতা আমার মনের উপর গভীর রেখাপাত করেছে। এর জন্য মহাবীরের প্রতি আমি বিশেষভাবে আকৃষ্ট হয়েছি। বুদ্ধদেবের মহিমাও অসীম। বিশ্ব জুড়ে তাঁর করুণার ভাবনা ব্যাপ্ত হয়ে আছে। তাঁর ব্যক্তিত্বে কোনোপ্রকার ন্যূনতার ছাপ

পড়বে এ আমি মেনে নিতে প্রস্তুত নই। মহাপুরুষদের ভিন্ন ভিন্ন বৃত্তি থাকে। কিন্তু এ বলতেই হবে যে, গৌতম বুদ্ধকে ব্যবহারিক ভূমিকা স্পর্শ করেছিল আর মহাবীরকে তা স্পর্শ করতে পারেনি। মহাবীর নারী-পুরুষের মধ্যে তত্ত্বগত ভেদ মানেন নি, তিনি এমন দৃঢ়প্রতিজ্ঞ ছিলেন। তাই আমার মনে তাঁর জন্য এক বিশেষ শ্রদ্ধা রয়েছে।

রামকৃষ্ণ পরমহংস

রামকৃষ্ণ পরমহংসদেবের সম্প্রদায়ে নারী কেবল একজনই ছিলেন আর তিনি ছিলেন সারদা দেবী। সারদা দেবী রামকৃষ্ণদেবের পত্নী ছিলেন এবং নামমাত্রই পত্নী ছিলেন। প্রকৃতপক্ষে তিনি শ্রীরামকৃষ্ণের মায়ের পর্যায়ে উঠেছিলেন এবং সম্প্রদায়ের ভ্রাতৃমণ্ডলীর কাছে তিনি মার আসন লাভ করেছিলেন। এ সত্ত্বেও তাঁকে ছাড়া আর কোনও নারীকে দীক্ষা দেওয়া হয়নি। মহাবীরের পর আড়াই হাজার বছর কেটে গেছে, কিন্তু ভগিনীদের দীক্ষা দেওয়ার সাহস হয়নি। আমি শুনেছি যে, রামকৃষ্ণ মঠে নারীদের দীক্ষা দেওয়ার সিদ্ধান্ত বছর কয়েক আগে গ্রহণ করা হয়েছে। নারী ও পুরুষের আশ্রম পৃথক রাখা উচিত—এ ভিন্ন কথা। কিন্তু এতদিন পর্যন্ত মেয়েরা যে দীক্ষা নিতে পারতেন না তা এখন নিতে পারছেন। এ থেকে অনুমান করা যায় যে, আজ থেকে আড়াই হাজার বছর আগে মহাবীর মেয়েদের দীক্ষা দিয়ে কত বড় সাহসিকতার পরিচয় দিয়েছিলেন।

শ্রীকৃষ্ণ ও মহাবীর

শ্রীকৃষ্ণ যে কাজ করেছিলেন তা সন্ন্যাস ধর্ম অবলম্বনের কাজ ছিল না। পক্ষান্তরে তা ছিল নারী ও পুরুষ যাতে ভক্তিভাবনায় সমান থাকে এবং অনাসক্তি ও নির্লিপ্তভাব বজায় রেখে পরস্পরের সঙ্গে অসংকোচে চলতে পারে সেই কাজ। জীবনের এ এক মৌলিক বিচার। বোনেরা সন্ন্যাস

গ্রহণের অধিকার পেলেই যে দলে দলে মেয়ে সন্ন্যাস নিতে থাকবেন এমন কিছু হওয়ার সম্ভাবনা নেই। তেমন অবস্থায় বোনেরা কম সংখ্যায়ই সন্ন্যাস নেবেন। এ আলাদা কথা, সন্ন্যাসে সমান অধিকার পাওয়ার মধ্যে এক ধরনের বিপদ আছে। কিন্তু সর্বসাধারণের গৃহস্থাশ্রমকেও যেন সংকোচ করা না হয়, একে অপরের সঙ্গে ভাই-বোনের মতো মেলামেশা করবে, শ্রীকৃষ্ণ এ কথা বলেছেন জীবনের দৃষ্টি থেকে। কিন্তু তত্ত্ববিচারের দিক থেকে মহাবীরের দৃষ্টান্ত আমার কাছে অদ্বিতীয় মনে হয়।

মহাত্মা গান্ধী

যে বিষয়ের মূলগত চিন্তা বা ভাব কোন গ্রন্থে লিপিবদ্ধ নেই এমন কোনও বিচার আমাদের দেশে কারো বড় একটা নজরে পড়ে না। এ দেশে ব্রহ্মচিন্তা অনেক হয়েছে। কিন্তু ব্যবহারিক বিচারের দিক থেকে শাস্ত্রে মূল বস্তু যদিও বা ছিল, তবু কার্যক্ষেত্রে তার প্রয়োগ হয়নি। এ কাজ গান্ধীজী আরম্ভ করেন আর তা এই যে, গৃহস্থাশ্রমে থেকেও মানুষ বানপ্রস্থাশ্রমের রীতি অনুযায়ী জীবন যাপন করতে সমর্থ। গৃহস্থের প্রচেষ্টা থাকবে বাণ-প্রস্থাশ্রমেরই দিকে। যখন গৃহস্থাশ্রমে থাকে তখন ঐ প্রতিজ্ঞায় সে আবদ্ধ হয়ে থাকে না এইমাত্র। সে প্রজা সৃষ্টি করে। যদি ইচ্ছা হয় তবে একে অপরেব প্রতি কর্তব্য পালনের প্রতিজ্ঞা গ্রহণ করে। সন্তানোৎপাদনের দায়িত্ব নেয়। কিন্তু ধীরে ধীরে সেই বাসনা থেকে মুক্ত হয়ে গৃহস্থাশ্রমেও বানপ্রস্থের বৃত্তি অবলম্বন করে থাকা সম্ভব। যত শীঘ্র গৃহস্থাশ্রম থেকে নিজেকে মুক্ত করা যায় ততই ভালো। বিবাহের পরে যদি একটিও সন্তান না হয় এবং মুক্ত হয়ে যায়, তাও ভালো। যদি একটি সন্তান হওয়ার পর মুক্ত হতে পারে তাহলেও ভালো। এর প্রচলন যে খুব বেশী হবে এমন নয়। এর জন্য পরিবেশ দরকার। আমরা সেই পরিবেশ সৃষ্টি করতে পারি নি।

ভোগের প্রাবল্য

যদিও গান্ধীজী সাদাসিধা জীবনযাপনের আদর্শ রেখে গেছেন, তবুও আজকাল ভোগময় জীবনযাত্রা প্রবলতরভাবে চলছে এবং বাড়ছে। স্বাধীনতা-লাভের পর গত দশ বছরে কিছু পরিবর্তন হয়েছে যার জন্য আমরা গৌরব বোধ করতে পারি; কিন্তু সেইসঙ্গে এমন কিছু পরিবর্তন হয়েছে যা দেখে কান্না আসে। ভোগ-বিলাসের সামগ্রী বেড়ে চলেছে। ভোগের প্রবৃত্তিতে যে ক্ষতি হচ্ছে তা বুঝে নেওয়ার ক্ষমতাও লোক হারিয়ে ফেলছে। অনুভব-শক্তি থাকলেও নিস্তারের কিছুটা ভরসা পাওয়া যেত। কিন্তু আজকাল ত জন্মনিয়ন্ত্রণের কথা নির্লজ্জভাবে প্রচার করা হয়। যে-সব ব্যক্তি এর প্রচার করেন, তাঁদের মধ্যে যে অনেক বড় বড় দয়ালু ও করুণাসম্পন্ন মানুষও আছেন তা আমি জানি। তাঁরা ব্যবহারিক দিক থেকে এরকম প্রচার করে থাকেন। কিন্তু তাঁদের 'করুণা' হচ্ছে গুজরাটী ভাষায় 'উপরছল্লী' অর্থাৎ উপর-উপর বস্তু, এতে গভীরতা নেই। এ ক্ষতিকর। তা এ দেশের আত্মশক্তিকে ক্ষীণ করে দেওয়ার কারণরূপে দেখা দিতে পারে। ফরাসী দেশে তাই হয়েছে। সেখানে পুরুষের হীনতা দেখা দিয়েছে আর পুরুষার্থ শক্তি ক্ষীণ হয়ে গেছে। কারণ ওখানকার সমস্ত আবহাওয়াই প্রতিকূল। এসব দেখে বুঝা যায় যে, গান্ধী-বিচার যদিও প্রসার লাভ করেনি তবুও এ বিচার লুপ্ত হয়ে যাওয়ার নয়, কারণ এতে এক নতুন পথের নিশানা রয়েছে। গৃহস্থের জন্যে এক পৃথক ক্ষেত্র তৈরী হয়েছে। গৃহস্থাশ্রমে প্রবেশ করলেও প্রথম দিন থেকে যারা চেষ্টা করবে তারা বেরিয়ে আসতে পারবে এবং ঐ চেষ্টা সত্ত্বেও যদি সন্তানের জন্ম হয় তবে তারা শক্তিশালী হবে। এই দৃষ্টি থেকেই গান্ধীজী গৃহস্থাশ্রমেও বানপ্রস্থবৃত্তি অনুসরণ করার কথা বলেছিলেন।

মদের দোকানে পিকেটিং

গান্ধীজী নারীজাতির সমগ্র শক্তি মুক্ত করে দিয়েছেন! অহিংসারূপ অস্ত্র

পাওয়া গেছে। এই অস্ত্রের ব্যবহার পুরুষ যতখানি করতে পারে তার চেয়ে ঢের বেশী করতে পারে নারীরা। নারীদের এখন নিজেদেরই শৃঙ্খল ছিন্ন করে বাইরে আসা চাই।

পঁচিশ বছর আগেকার কথা। মদের দোকানে পিকেটিং করার ব্যবস্থা কী করে করা যায় তা নিয়ে আলোচনা চলছিল। কেউ এক পথ দেখালেন ত কেউ অন্য পথ। গান্ধীজী বললেন, এ কাজের ভার মেয়েদের উপর দেওয়া উচিত। গান্ধীজীর কথা শুনে ত সবাই একেবারে অবাক্। যেখানে সম্পূর্ণ নীতিজ্ঞানহীন লোকেদের যাতায়াত আর যেখানে সবরকমের কদর্য আচরণ চলতে থাকে, সেখানে মেয়েরা গিয়ে করবে কি? কিন্তু গান্ধীজী বললেন, মেয়েরাই ওখানে কাজ করবে। যারা সবচেয়ে পতিত তাদের বিরুদ্ধে আমাদের কাছে সর্বশ্রেষ্ঠ যে নৈতিক শক্তি রয়েছে তাই পাঠানো উচিত। সেই অনুসারে মেয়েরা মদের দোকানে পিকেটিং করতে গিয়েছিলেন। আর তাঁরা যে কাজ করেছেন সারা ভারত তা দেখেছে।

আন্নাসাহেব একবার ওয়ার্ধা এসেছিলেন। তিনি বললেন, গান্ধীজী যাদু করে দিয়েছেন। নারী-প্রগতির জন্যে পঁচিশ বছর কঠিন পরিশ্রম করেও আমরা যে কাজ করতে পারিনি এবং যার কল্পনাও করতে পারিনি সে কাজ গান্ধীজী করে দিলেন। গান্ধীজী কি করেছেন, করেছে ত অহিংসা। যত দিন পর্যন্ত হিংসা আপনাদের অস্ত্র থাকবে, ততদিন আপনারা দুনিয়ার যত তন্ত্রেরই প্রবর্তন করেন না কেন, নারীদের স্থান দ্বিতীয় শ্রেণীতেই থেকে যাবে। শত চেষ্টাতেও তারা প্রথম স্থান পাবে না। এ জন্যেই নারীদের প্রথম স্থান দিতে হলে রক্ষণের সাধন অহিংসা হওয়া একান্ত প্রয়োজন। এতে মাতৃশক্তি প্রতিষ্ঠা পাবে। ভগবান বুদ্ধ ও মহাবীরের যুগে নারীজাতির উদ্ধার হয়েছিল আর গান্ধীজীর দৌলতে নারীজাগরণ সম্ভব হয়েছে। কারণ এঁরা অহিংসাকে রক্ষণ-শক্তি বলে মেনেছেন, হিংসাকে নয়। হিংসা ত ভক্ষণ-শক্তি।

অন্তর্বর্তী যুগ

মধ্যবর্তী সময়ে এমন একটা যুগ এসেছিল যার কোনও সংজ্ঞা নির্ধারণ করা চলে না। তখন না কেউ মহাবীরের মতো দীক্ষা দেবার কথা বলেছে, না কেউ গান্ধীজীর মতো বানপ্রস্থবৃত্তির কথা বলেছে এবং না কেউ শ্রীকৃষ্ণের মতো সর্বত্র একসঙ্গে সহজভাব রেখে বিনা সংকোচে কাজ করার কথা বলেছে। সেযুগে ভক্তির দ্বারা নারীদের জন্যে মুক্তির দ্বার খোলার কথা চলত। সেসময় বোনদের সন্ন্যাস গ্রহণে নিষেধই ছিল। মাঝখানে এমন অবস্থা হল যে, পুরুষ সন্ন্যাসী মেয়েদের দর্শন পর্যন্ত করতে পারত না। একবার মীরাবাঈ বৃন্দাবনে গিয়েছিলেন। সেখানে এক সন্তপুরুষ ছিলেন যাঁর খুব নামডাক ছিল। মীরা তাঁর সাক্ষাৎপ্রার্থী হলেন। তিনি আশা করেছিলেন যে, সন্ন্যাসীর দর্শন পেলে কিছু জ্ঞানপ্রাপ্তির সুযোগ পাওয়া যাবে। কিন্তু যখন সন্ন্যাসীর কাছে দর্শনের অনুমতি প্রার্থনা করা হল তখন জবাব পাওয়া গেল যে, স্বামীমহারাজ নারীদের মুখদর্শন করেন না। একথা শুনে মীরার খুব আশ্চর্য লাগল। দুঃখ হল না, কারণ তিনি দুঃখের ঊর্ধ্বে ছিলেন, ভক্ত ছিলেন। তিনি এক ভজন লিখলেন—

হুঁতো জাণতী হতীকে ব্রজমাঁ পুরুষছে এক।
বৃজমা বসীনে তমে পুরুষ ছো, ভালো তমারো বিবেক॥

এর মধ্যে এক বিনম্র তিরস্কার রয়েছে যে, ব্রজে বাস করেও সন্ন্যাসীর পুরুষত্বের অহঙ্কার যায়নি! যাঁরা ব্রজে যান তাঁরা ভগবানের উপাসনা করেন। উপাসনা নারী। এজন্যে উপাসনাবৃত্তি দ্বারা ভগবানকে পুরুষ কল্পনা করে নিজেকে নারী মনে করা হত।

ঐ সময় সন্ন্যাসীদের এমন কঠিন রূপ ছিল এবং অন্যদিকে নারীদের সন্ন্যাস দেবার কোন কথাই ছিল না। কিন্তু সেযুগে ভক্তিমার্গ পথ খুলে দিয়েছিল। মারোয়াড়ে মীরাবাঈ, উত্তর প্রদেশে সহজাবাঈ, মহারাষ্ট্রে মুক্তাবাঈ প্রভৃতি কয়েকজন ভক্তশিরোমণি নারীর উদ্ভব হয়েছিল। ভারতের পক্ষে

এ এক গৌরবোজ্জ্বল অধ্যায়। এর একটা মর্যাদা আছে যা সংসারাশ্রমী নারীদের নেই। কারণ এর সম্বন্ধ ভক্তির সঙ্গে। যেখানে ভক্তির সম্বন্ধ আছে সেখানে নারী-পুরুষের ভেদ লোপ পেয়ে যায়।

নিজের উদ্ধার নিজেরই হাতে

আমি মনে করি যতদিন পর্যন্ত শঙ্করাচার্যের মতো তীব্র বৈরাগ্যসম্পন্ন নারীর আবির্ভাব না হবে, ততদিন পর্যন্ত কৃষ্ণ, বুদ্ধ এবং গান্ধীর মতো পুরুষও নারীজাতির উদ্ধার করতে সক্ষম হবেন না। কারণ আত্মোদ্ধারের যে লক্ষ্য তা কোথায় পাওয়া যাবে? অন্যেরা কিছু সাহায্য করতে পারে এই পর্যন্ত। কিন্তু নারীজাতির উদ্ধার ত নারীদের দ্বারাই হওয়া সম্ভব। এমন নারীর আবির্ভাব হলে, তা হবে শঙ্করাচার্যের মঠের উপর আরোহণ। তা যে শঙ্করাচার্যেরই পীঠ হবে, তা নয়। তা হবে নারীদের নিজস্ব পীঠস্থান। আমি ভেবে পাই না কেন এমন সব বৈরাগ্যশীলা ও জ্ঞানানুসন্ধী বোনেদের আবির্ভাব হবে না যারা শাস্ত্র প্রণয়ন করতে পারবেন, ধর্মের পরিবর্তন করতে পারবেন? নারীরা নিজেরাই যাতে এগিয়ে যেতে পারে এমন কোন নির্দেশ হিন্দু ধর্মে নেই। সেই নির্দেশ অর্জন করার কাজ এখনও বাকি রয়েছে।

পন্‌ঢরপুর,
৩১ ৫. ৫৮

আত্মশক্তি বিকশিত কর

নারীদের রক্ষাকর্তা পুরুষেরাই—এ ধারণা আবহমানকাল ধরে চলে এসেছে। যতদিন এ ধারণা কায়েম থাকবে, ততদিন মেয়েদের সত্যিকারের রক্ষা অসম্ভব। বস্তুতপক্ষে এ মনে করারই প্রয়োজন নেই যে, মেয়েদের রক্ষা করতে হবে। কিন্তু এরকমই করা হয়ে থাকে। কেন হয়েছে? এই জন্য যে হিংসার যোগ্যতা

নারীদের মধ্যে নেই। হিংসার ক্ষেত্রে এরা পুরুষদের তুলনায় অনেক দুর্বল। এই জন্যই পুরুষরা নারীদের রক্ষকর্তা হয়ে আছে। অর্থাৎ হিংসার প্রতিষ্ঠাকে এখানে স্বীকার করে নেওয়া হয়েছে। কিন্তু বর্তমান পরিস্থিতি আমাদের স্পষ্ট এই নির্দেশ দিচ্ছে যে, হিংসার নয়, অহিংসারই প্রতিষ্ঠা করতে হবে।

আত্মজ্ঞান অত্যন্ত সরল

আমাদের বুঝা উচিত যে, নারীরা যেকোন অবস্থায় আত্মবলের উপর নির্ভর করে নিজেকে অবশ্যই রক্ষা করতে সক্ষম। দৈহিক শক্তির পরিবর্তে আত্মশক্তির উপর বেঁচে থাকার কৌশল আমাদের শিখে নিতে হবে। আমি ত মনে করি যে, যিনি জীবনভর একনিষ্ঠ সেবা করতে ইচ্ছুক তাঁকে আত্মজ্ঞানের কথা বুঝতেই হবে। আত্মজ্ঞান শব্দটি আমাদের কাছে কঠিন বলে মনে হয়। কিন্তু বিষয়টি এত সরল যে একটি সাধারণ বালকও তা সহজে বুঝে নিতে পারে। গণিত শেখা কিছু কঠিন হতে পারে, কিন্তু আত্মজ্ঞান অনেক সহজ। ওয়ার্ডস্ওয়ার্থের 'উই আর সেভেন' একটি বিখ্যাত কবিতা। সেখানে একটি বালিকা আপন মৃত ভাইদেরও গণনার মধ্যে নিয়ে বলছে যে তারা সাত ভাই-বোন। কারণ আত্মার অমরতার অনুভূতি সহজাত।

শরীর-পরায়ণতা ও ভয়

আত্মজ্ঞানের এ কথা হৃদয়ঙ্গম করা, কঠিন নয়, কিন্তু এর উপর বিশ্বাস অটুট রাখা কঠিন বলে মনে হয়। এর কারণ আজকাল আমাদের সমস্ত জীবনটাই শরীর-প্রধান হয়ে গেছে। আমরা হয়ত সৌন্দর্য সম্বন্ধে ভাবি, কি শক্তি সম্বন্ধে ভাবি, কিন্তু আমাদের দৃষ্টি শরীর-প্রধানই থেকে যায়। যতদিন এই শরীর-পরায়ণতা থাকবে, ততদিন মেয়েদের মনে ভয়ও থাকবেই। মানুষের এই শরীর-পরায়ণতার সুযোগ নিয়ে অত্যাচারীরা প্রচুর লাভবান হয়েছে। শরীর-পরায়ণতাই ভয়ের উৎসস্থল।

নির্ভয়তার জ্যোতি

রামায়ণে আমরা সীতার বর্ণনা পড়েছি। রাবণ তাঁর সঙ্গে কুরুচিপূর্ণ কথা বলত, কিন্তু সীতা রাবণের সঙ্গে কথাই বলতেন না। একবার যা-ও বলেছিলেন তাও সামনে তৃণধারণ করে। এতে সীতা বুঝাতে চেয়েছেন, 'হে রাবণ তোকে আমি তৃণের মতো মনে করি।' রাবণ তাঁর কোন অনিষ্ট করতে পারেনি। আমরা সীতার উদাহরণকে যেন অসাধারণ বলে মনে না করি। তাই যদি হত, তাহলে এরকম দৃষ্টান্ত আমাদের সামনে কেন রাখা হয়েছে? কংগ্রেসের সভানেত্রী (অধ্যক্ষা) সকলেই হতে পারে না, কিন্তু সীতা সবাই হতে পারে। কারণ এর বিষয়বস্তু আত্মার। আত্মশক্তিতে নির্ভরশীল ব্যক্তির চোখে যে নির্ভয়তার জ্যোতি থাকে তা অপরকে প্রভাবিত না করে পারে না। পশু পর্যন্ত চোখের ঐ জ্যোতিকে চেনে।

বাল্মীকি ও নারদের দৃষ্টান্ত ত সকলেরই জানা। বাল্মীকি বহু নরহত্যা করেছিলেন, কিন্তু তখনও নারদের মতো নির্ভীক লোকের সঙ্গে তাঁর সাক্ষাৎ হয়নি। নারদের আগে এমন লোকের সঙ্গেই তাঁর দেখা হয়েছে যারা হয় ভয়ে পালাত, না হয় রত্নাকরকে আক্রমণ করত। নারদের মতো হাসিমুখে বিবেকের কথা বলতে পারেন এমন লোকের সাক্ষাৎকার রত্নাকরের জীবনে ঐ প্রথম। ফলে যে রত্নাকর প্রথমে এক হিংস্র ভীল ছিল, সে পরে এক মহান্ ঋষিতে রূপান্তরিত হয়ে গেল। এই কাহিনীটিতে জীবনের সিদ্ধান্ত নিহিত হয়েছে। যদি আমরা নির্ভীক ও শান্ত থাকি, তাহলে আমাদের উপর যে অস্ত্র তুলবে তার হাত থেমে যাবে।

শ্রদ্ধার আবশ্যকতা

এক ভাই আমাকে প্রশ্ন করেছিলেন, মহিলাশ্রমের মতো সংস্থায় গুণ্ডার আক্রমণ হলে কি করা কর্তব্য। এর উত্তর সহজ। যদি সকলের ভালো মনে হয়, তবে যখনই আক্রমণ করা হবে আমাদের মেয়েরা বিউগ্‌ল বাজাবে এবং

একত্রিত হয়ে ভগবানের নামকীর্তন করতে আরম্ভ করবে। কিন্তু এর জন্যে প্রয়োজন শ্রদ্ধার।

দৈহিকবলের নিষ্ফলতা

তা না করে মনে করুন আমরা যদি বোনেদের হাতে তলোয়ার দিই, তাহলে এমনও হতে পারে যে আক্রমণকারীদের হাতে তলোয়ার অপেক্ষাও মারাত্মক অস্ত্র রয়েছে, সেখানে আমাদের অস্ত্র কোন কাজেই আসবে না। গত যুদ্ধে আমরা শারীরিক শক্তির বিফলতার সুন্দর পরিচয় পেয়েছি। যেমন দশ-বিশ লক্ষ লোক একসঙ্গে অন্য দেশের উপর আক্রমণ চালিয়েছে, ঠিক তেমনি লক্ষ লক্ষ লোক নিজ-নিজ অস্ত্র রেখেও দিয়েছে। যেখানে তারা দেখে যে প্রতিপক্ষ বলবান সেখানে তারা অস্ত্র রেখে দেয়। কারণ সেখানে তাদের ভরসা নষ্ট হয়ে যায়।

আমাদের নির্ভর করতে হবে আত্মশক্তির উপর। মেয়েদের মধ্যে আত্মশক্তি কিছু কম নেই, কিন্তু তার বিকাশের জন্য জীবনকে সেভাবে গড়ে তুলতে হবে। খাওয়ার জন্য বাঁচা নয়, বাঁচার জন্য খেতে হয়। যেমন আমরা ঘরের জন্য ভাড়া দিই অথবা চরখা থেকে কাজ পাওয়ার জন্য তাতে তেল দিই, ঠিক তেমনি শরীর থেকে কাজ পাওয়ার জন্য তাকে আমাদের উপযুক্ত খাদ্য দিতে হবে! দেওয়ালি উৎসব উপলক্ষে ত আমরা চামেলীর তেল ব্যবহার করি না। ঠিক তেমনি সখ বা ভোগের জন্য নয়, প্রয়োজন অনুসারেই শরীরকে খাদ্য দিতে হবে, কেননা এ-ই হচ্ছে বিজ্ঞানের নিয়ম। এতে ভোগ-বিলাসের স্থান নেই। তা ছাড়া ভোগ-বিলাসপূর্ণ জীবন কিছুদিন পরে হীনবীর্য হয়ে পড়ে।

অপমান বনাম মৃত্যু

কেউ যদি এরূপ বলে—তোমাকে মুসলমান হতে হবে নয়ত মেরে ফেলা

হবে, তবে তাকে সোজাসুজি এখানে বুঝাতে হবে—'ভাই, মুসলমান হওয়া ত বিশেষ একরকমের শ্রদ্ধা, আর শ্রদ্ধা বলপূর্বক আনা যায় না।' এর পরেও প্রতিপক্ষ যদি মূর্খই হয় এবং বলে, 'হয় কলমা পড়, না হয় মর', তাহলে শান্তভাবে বলা যেতে পারে, 'ভাই, মরতে ত সবাইকেই হবে। নাও, মারতে হয় মার।' তা না করে প্রতিপক্ষের কথা যদি নীরবে মেনে নেওয়া হয়, তাহলে দেহকে হয়ত বাঁচাতে পারি, কিন্তু তাতে আত্মাকে চরম অপমানিত করা হবে। অপমানিত হওয়ার চেয়ে যদি মৃত্যুকে বরণ করার শক্তি থাকে, তবে ছোট শিশুও নির্ভয়ে সংকটের সম্মুখীন হতে পারে।

সুব্যবস্থিত হওয়ার শিক্ষা

এরূপ সুব্যবস্থিত হওয়ার শিক্ষা আমাদের গ্রহণ করতে হবে। আগুন যদি লেগে যায়, তবে সকলে মিলে যাতে শৃঙ্খলার সঙ্গে তা নেবাবার ব্যবস্থা করতে পারি আমাদের সেই শিক্ষা নিতে হবে। যুদ্ধবিদ্যা, লাঠি-খেলা প্রভৃতির মাধ্যমে ব্যবস্থিত হওয়ার শিক্ষা লাভ করা যেতে পারে; কিন্তু তাতেই কাজ হয়ে যাবে এমন যেন আমরা মনে না করি। শরীর ও আত্মার মধ্যে যে প্রভেদ রয়েছে তা আমাদের জানতে হবে। আমরা যদি তা বুঝে নিতে পারি, তবে শরীর সম্বন্ধে আমাদের বেপরোয়া হতে ও হাসিমুখে মৃত্যুবরণ করতে সাহায্য করতে পারে।

মহিলা-আশ্রমের মতো সংস্থায়, যেখানে দেশের প্রত্যেক প্রান্ত থেকে বোনেরা আসেন এবং সুসংস্কার ও সুশিক্ষা লাভ করেন, সেখানে যদি আপনারা এরূপ নির্ভয়ে থাকা ও মৃত্যুবরণ করার সাহস অর্জন করেন, তবে স্বাভাবিক পরিস্থিতিতে আপনারা দেশের মহান সেবার অধিকারী এবং পরম শ্রেয়-লাভে সমর্থ হতে পারেন।

মহিলা-আশ্রম, ওয়ার্ধা,

৫.১১.৩৬

উদ্ধরেৎ আত্মনা আত্মানম্

একটি প্রশ্ন : 'নারীজাতির উদ্ধার নারীদের দ্বারাই হতে পারে—আপনি এরূপ বলেন। কিন্তু তা কী করে সম্ভব হতে পারে ?'

নারীজাতির উদ্ধার ত তখনই হতে পারে, যখন তাদের জাগরণ হবে এবং শংকরাচার্যের মতো প্রখর জ্ঞান-বৈরাগ্যসম্পন্না, ভক্তিমতী ও নিষ্ঠাবতী নারীর আবির্ভাব হবে। আজ পর্যন্ত যেসব লোকের প্রভাব সমাজের উপর পড়েছে তাঁরা সকলেই পুরুষ। ধর্মও তাদের দ্বারাই প্রভাবিত হয়েছে। ধর্মের উপর যখন নারীদেরও প্রভাব পড়বে তখনই তাদের উদ্ধার হবে। আর তা হওয়া অত্যন্ত প্রয়োজন।

নারীজাতির উদ্ধারক রূপে ভগবান শ্রীকৃষ্ণের আবির্ভাব হয়েছিল। মহাবীরও নারীজাতির জন্যে কাজ করেছেন। গান্ধীজীও তাদের সেবা করে গেছেন। আন্নাসাহেব কার্ভের মতো পুরুষ নিজের সারাজীবন একাজে উৎসর্গ করেছেন। স্বামী দয়ানন্দ নারীদের সম্বন্ধে অনেক বলেছেন ও করেছেন। এ সত্ত্বেও নারীজাতির আজ কি অবস্থা ? সমাজে পুরুষদেরই অধিকার বেশী। কারণ যাঁরা নারীদের হয়ে কাজ করেছিলেন তারা সবাই পুরুষ ; তাই তাঁরা বিশেষ কিছু করতে পরেননি। এ কাজ মেয়েদের নিজেদেরই করতে হবে, তবেই তা সার্থক হতে পারবে। মানুষের উদ্ধার তার আত্মবলের দ্বারাই সম্ভব—এ এক অভিজ্ঞতালব্ধ সিদ্ধান্ত। যে নিজে চেষ্টা করে, ঈশ্বর তারই সহায়ক হন। তার মনে যখন অত্যন্ত তীব্রতা দেখা দেয়, ঈশ্বরও তখনই সাহায্য করেন। যদি তীব্রতা না আসে, প্রচেষ্টায় ব্যাকুলতা না থাকে, তবে ভক্তির উদ্রেক হয় না। যখন তীব্রতা আসে তখন ভক্তির উদ্রেক হয় এবং তখন ঈশ্বরও সাহায্য করেন। কোনও জীবের উদ্ধার সেই জীবের তীব্র ইচ্ছা থেকেই হতে পারে। তার ইচ্ছাশক্তি থেকেই সমস্ত কাজ হবে। ভগবান ত সকল জীবের উদ্ধারকর্তা আছেনই ; কিন্তু যে নিজের উদ্ধারের জন্যে তীব্র ইচ্ছাশক্তি পোষণ করে তাকেই ঈশ্বর সাহায্য করেন।

ব্রহ্মবাদিনী নারী

এক সময় নারীর পূর্ণ স্বাধীনতা ছিল। পুরুষ যেমন ব্রহ্মবাদী ছিলেন, তেমনি ব্রহ্মবাদিনী ছিলেন নারী। মেয়েদের কিছু সূক্তও (উত্তম উক্তি) বেদে রয়েছে। পূর্বে বেদাধ্যয়নে নারীর অধিকার ছিল। এখন নারীদের বেদপাঠের অধিকার দেওয়া হয় না। কিন্তু বেদে অম্ভৃণী ঋষি-কন্যা রচিত এক সূক্ত আছে। আগে এমন সব ব্রহ্মবাদিনী নারীর আবির্ভাব হয়েছিল, যাঁদের রচিত সূক্তও বেদে অত্যন্ত প্রসিদ্ধ। তাঁরা ঈশ্বরের সঙ্গে এত একরূপ হয়ে গিয়েছিলেন যে ঈশ্বরের গুণগান করার সময় বলতেন—ঈশ্বরের কৃতি আমাদেরই কৃতি।' তাঁরা গেয়েছেন, 'সৃষ্টির সমস্ত প্রাণী আমাদের আশ্রয়ে থাকে, কিন্তু তারা তা জানে না—তারা আমাদের আশ্রয়েই কাজ করে।'

ঈশ্বরের সঙ্গে একরূপ হয়ে, ঈশ্বরের সর্বময় কর্তৃত্ব স্বীকার করে নিয়ে এক নারী বর্ণনা করেছেন—'আমি যাঁকে বড় করতে চাই তাঁকে বড় করি, যাঁকে ঋষি করতে চাই তাঁকে ঋষি করি। ঈশ্বরের কর্তৃত্ব আমার কর্তৃত্ব।' ঈশ্বরের রূপ গ্রহণ করে একথা বলা হয়েছে।

আজ নারীর স্বাধীন স্বত্বা লুপ্ত

এরকম নারীর কথা আজ কল্পনাও করা যায় না। কোনও নারীর প্রভাব সমাজের উপর পড়ছে আজ এমন দেখা যায় না। আজ নারীর কোন স্বতন্ত্র ব্যক্তিত্বই নেই। স্বতন্ত্রভাবে সে বেঁচে নেই। তার পরিচয় হয় কারো স্ত্রী, নয় কারো বোনরূপে। আজকাল নারীদের কিছু সুবিধা দেওয়া হচ্ছে দেখা যায়। বিদ্যালয়ে তাঁরা শিক্ষিকা হন, অফিসে কাজ করেন, আইন থেকে তাঁরা পুত্রের সমান অধিকার পেয়ে থাকেন। বিদ্যালয়ে মেয়েরা পড়তে পারে। পুরুষদের সঙ্গে সমানভাবে কাজ করতে পারে। ধূমপানও করতে

পারে। এত সব অধিকার যদিও তারা পেয়ে গেছে, তবু তাদের উদ্ধার তাতে হবে না। উদ্ধার তখনই হবে, যখন তারা আধ্যাত্মিক অধিকার লাভ করতে সক্ষম হবে। এ অধিকারের কথা কেবল হিন্দুধর্মের জন্যে নয়, অন্যধর্মের জন্যেও। বাইবেলে বলা হয়েছে, নারীদের মাথার উপর পুরুষ, পুরুষদের মাথার উপর ঈশ্বর। অর্থাৎ ঈশ্বরের সঙ্গে মেয়েদের সরাসরি সম্বন্ধ নেই। পরম্পরাক্রমে মাঝখানে এক এজেন্সির মাধ্যমে নারী ঈশ্বরের সাক্ষাৎ লাভ করতে পারে। এ কথা খৃষ্টধর্মে আছে, হিন্দুধর্মেও আছে। হিন্দু-ধর্মে ত স্ত্রী স্বামীর হাতে হাত রাখে আর স্বামীর হাত দিয়েই সব ধর্ম কাজ করে। এ যেন ইঞ্জিনের সঙ্গে গাড়ী জুড়ে দেওয়ার মতো ব্যাপার। তারপর ইঞ্জিন যেখানে যাবে গাড়ীও সেখানে যাবে। এভাবে পুরুষরূপী ইঞ্জিনের সঙ্গে নারীরূপী বগি জুড়ে দেওয়া হয়েছে। যদিও বগিতে পেয়ারা, কলা বা আঙ্গুর ভরা থাকে আর ইঞ্জিনে কয়লা—তবু ইঞ্জিন ত ইঞ্জিনই। ইঞ্জিন গাড়ীকে টেনে নেয় এবং ইঞ্জিনের গতির সঙ্গে তাল মিলিয়ে গাড়ী চলে। এ ভাবেই কোন নারী গান্ধীর সঙ্গে, কেউ বা কৃষ্ণের সঙ্গে জুড়ে যান ও সহগতি প্রাপ্ত হন। নারীর নিজস্ব গতি নেই। তার গতি পরনির্ভরশীল হয়ে গেছে।

নারীদের উদ্ধারের পথ

আজকাল নারীদের মতামত প্রকাশ করার অধিকার হয়েছে। এ সত্ত্বেও অনেকে স্বামীর মত নিয়ে ভোট দেন। এ অধিকার তাঁরা আদায় করে নেন নি, এ অধিকার তাঁরা অমনি পেয়েছেন। অন্য দেশে মেয়েদের এ অধিকার নেই। এদেশে মেয়েদের এ অধিকার আদায়কৃত নয়, অমনি পাওয়া। কিন্তু অধিকার ত অর্জন করতে হয়। কাজেই মেয়েরা মত দেওয়ার সুযোগ পেলেও তাকে অধিকার বলা চলে না। তাই, এ আমার অধিকার, এ দিয়ে

আমি কিছু করতে পারি—এরকম কোন কিছুর আভাস পর্যন্ত মেয়েদের মধ্যে দেখা যায় না। মেয়েরা যখন নিষ্ঠাবতী ও আধ্যাত্মিক গুণসম্পন্না হবেন, শাস্ত্রে পরিবর্তন আনতে সক্ষম হবেন কেবল তখনই তাঁদের উদ্ধার সম্ভব। সে-শাস্ত্রে নারী-পুরুষের কোন ভেদ থাকবে না। তাঁরা যখন এরকম নতুন শাস্ত্র রচনা করবেন, তখন মানবধর্মেরও উদ্ধার হবে। শাস্ত্রকার হিসেবে কেবল শঙ্করাচার্য, বাদরায়ণ প্রভৃতি পুরুষদেরই দেখা যায়, কিন্তু এদের মতো যুগান্তকারী কোন নারী যখন আবির্ভূতা হবেন ও মানবতার শাস্ত্র রচনা করবেন, তখনই নারী ও মানবতা উভয়েরই উদ্ধার হবে।

সোখড়া (বড়োদা),
২৮ ১০. ৫৮

নারীর স্বাধিকার লাভের উপায়

সন্ন্যাস, ব্রহ্মচর্য, পরিব্রজ্যা ইত্যাদির অনুমতি পেলেই যে হাজার হাজার মেয়ে সন্ন্যাসিনী হয়ে যাবেন এমন নয়। পুরুষদের সে সুযোগ রয়েছে, তাই বলে হাজার হাজার পুরুষ সন্ন্যাসী হয়ে যাচ্ছে না। কিন্তু অনুমতি না থাকা, অপাত্রজ্ঞান করায় প্রগতির পথে বাধার সৃষ্টি হয়। হিন্দুধর্মে আগে এসব ছিল না। কিন্তু মাঝখানে মনে করা হল, কলিযুগে সন্ন্যাস বর্জনীয়। তার উপর শংকর-সম্প্রদায় থেকে আঘাত এল। শংকরাচার্যের গুরু ছিলেন সন্ন্যাসী। প্রথমে তিনি ছিলেন গৃহী এবং পরে সন্ন্যাসী হয়েছিলেন। শংকরাচার্য ব্রহ্মচর্য থেকেই সন্ন্যাস নেওয়ার ইচ্ছা প্রকাশ করেছিলেন। তিনি মার কাছে সন্ন্যাস গ্রহণের অনুমতি প্রার্থনা করেন। মা অনুমতি দিচ্ছিলেন না, কিন্তু পরে বাধ্য হয়ে অনুমতি দিতে হয়। আমরা শংকরাচার্যের নাম নিয়ে খুব গর্ব করি। হিন্দুধর্মে ভগবান শ্রীকৃষ্ণের পর সবচেয়ে বেশী প্রভাব শংকরাচার্যের। তাঁর ভাষ্য, স্তোত্র ইত্যাদি দেশের সর্বত্র পাঠ করা হয়। কিন্তু তাঁর জীবিতকালের অবস্থা আমরা কল্পনাও করতে পারি না।

চির উন্নত শির

শংকরাচার্য সন্ন্যাস গ্রহণ করে বেরিয়ে পড়লেন এবং উত্তরাঞ্চলে ভ্রমণ-কালে তাঁর মার কথা মনে হল। তিনি ভাবলেন মা তাঁকে ডাকছেন। তিনি দক্ষিণ দিকে রওনা হলেন। বাড়ী পৌঁছে দেখলেন মা মৃত্যুশয্যায়। মার ভগবদ্দর্শন হওয়া প্রয়োজন, তাই তিনি কৃষ্ণাষ্টক রচনা করে মাকে দিয়ে তা আবৃত্তি করালেন। কথিত আছে যে সর্বশেষ পংক্তির আবৃত্তি শেষ হতেই মা ঈশ্বর-দর্শন লাভ করেছিলেন। মা নিজের ছেলেকে সন্ন্যাস গ্রহণের অনুমতি দিয়েছিলেন কিন্তু কলিযুগে সন্ন্যাস বর্জনীয় বলে ধরা হয়েছিল। তাই সমাজের পক্ষ থেকে অর্থাৎ নাম্বুদ্রী ব্রাহ্মণসমাজ থেকে তাঁকে একঘরে করা হয়েছিল; যেমন পোপের পক্ষ থেকে টলষ্টয়কে একঘরে করা হয়েছিল বা গান্ধীজীকে হিন্দুর শত্রু মনে করে হত্যা করা হয়েছিল। যাহোক, সমাজবহিষ্কৃত বলে শংকরাচার্যের মাকে শ্মশানে নিয়ে যাওয়ার জন্য ব্রাহ্মণসমাজের কেউ এল না। অন্যদিকে জাতিভেদের দরুন অন্য জাতির লোকও আসতে পারল না। তখন শংকরাচার্য অস্ত্রের সাহায্যে শবদেহকে তিন খণ্ড করে এক এক খণ্ড নিয়ে গিয়ে দাহ করলেন। তিনি মহাজ্ঞানী ছিলেন। এমন অবস্থায় পড়েও তিনি টলেননি। তিনি ক্ষমা চাইলে ব্রাহ্মণেরা হয়ত শ্মশানযাত্রার জন্য সাহায্য করতে আসতেন। কিন্তু তিনি ক্ষমা ভিক্ষা করেননি।

অধিকার লাভের উপায়

আজ শংকরাচার্যের এত সম্মান যে নাম্বুদ্রী ব্রাহ্মণ সম্প্রদায় তাঁর স্মৃতি-রক্ষার উদ্দেশ্যে দাহের আগে শবের উপর তিনটি আঁচড় কেটে দেয়। কিন্তু সে-যুগে সমাজ এত কঠোর ছিল যে মৃতদেহ শ্মশানে নিয়ে যাওয়ার জন্য কেউ আসেনি। এ সত্ত্বেও শংকরাচার্য সমাজের উপর কোন দোষারোপ করেননি। তাঁর রচিত গ্রন্থগুলিতে এ সম্বন্ধে কোথাও কোন ইঙ্গিত পর্যন্ত

নেই। উত্তম সংস্কারের লক্ষণই এমন। সন্ন্যাসে অধিকার লাভের জন্য শংকরাচার্যকে এত সব করতে হয়েছিল। এক একটি অধিকার এভাবেই অর্জন করতে হয়।

নারী-পুরুষের সমান অধিকার

নারী-পুরুষের সমান অধিকারও এভাবেই লাভ করতে হবে। মেয়েরা যদি পুরুষদের মতো ধূমপান করতে চায়, তবে সেই অধিকার তারা সহজেই পেতে পারে। কিন্তু তারা যদি সন্ন্যাস, ব্রহ্মচর্য, পরিব্রজ্যা বা মোক্ষের অধিকার লাভ করতে চায়, তাহলে কোন জ্ঞানবতী প্রখর বৈরাগ্যসম্পন্না নারীর আবির্ভাব হলে তবেই তা সম্ভব হবে। গান্ধীজীর দান বা অন্য কারো দান থেকে তাদের সে অধিকার লাভ হবে না। যখন শংকরাচার্যের সমপর্যায়ের ত্যাগবৈরাগ্যসম্পন্ন কোন নারী আবির্ভূতা হবেন, তখনই তাদের সে অধিকার লাভ হবে।

ওয়ড্ডুমপালেয়ম্,
১১. ১০. ৫৬.

মাতৃশক্তির মহত্ত্ব

জীবিকার্জনের জন্য যাদের শরীরশ্রমের উপর নির্ভর করতে হয় তাদের আমরা নীচ বলে মনে করি। তাদের কোনো ছুটি নেই। মেথরকে যদি একদিনের জন্যেও ছুটি দেওয়া হয়, তবে সমস্ত অঞ্চল দুর্গন্ধে ভরে যাবে। এতখানি উপকার যারা করে তাদের আমরা নীচ ভাবি! পরিচ্ছন্ন থাকার জন্য আমরা তাদের এক টুকরো সাবান পর্যন্ত দিই না। তাদের কোন ইজ্জত নেই, প্রতিষ্ঠা নেই, সম্মান নেই। মেথর কী? মেথর মানে মেহ্তর, মানে 'মহত্তর'। এমন যারা শ্রেষ্ঠ তাদেরই আমরা নীচ বলি। শ্রেষ্ঠকে ত এভাবে নীচ বলে মনে করিই, আবার নিজের মাকেও নীচ বলে মনে করি।

মার গৌরব

শাস্ত্র বলে, দশজন উপাধ্যায়ের সমান একজন শিক্ষক, একশত শিক্ষকের সমান একজন পিতা আর সহস্র পিতার চেয়েও বড়ো মা। মার এত গৌরব শাস্ত্রে কীর্তিত হয়েছে। এ হচ্ছে শাস্ত্রের কথা। কিন্তু ব্যবহারিক জীবনে আমরা নারীদের হীন মনে করি। মেয়েরা যদি ক্ষেতে কাজ করে, তবে তাদের আমরা কম মজুরী দিই। কিন্তু তাদের ত বেশী মজুরী দেওয়া উচিত। কারণ ঘর-সংসারের সমস্ত কাজও তাদের করতে হয়। শিশুদের লালনপালন করতে হয়। তবু পারিশ্রমিক বেশী ত দেওয়া হয়ই না, সমানও দেওয়া হয় না। সব ক্ষেত্রেই নারীর শ্রমমূল্য কম আর তাকে বোঝা স্বরূপ মনে করা হয়। মেয়েরা দিন-রাত কাজ করে, তবু তাদের বোঝা স্বরূপ মনে করা হয়। এর কারণ সমাজে শ্রমেরই প্রতিষ্ঠা নেই।

লোকে বলে মেয়েরা উৎপাদনের কাজ করে না, তারা কেবল রান্নার কাজ করে। রান্না যে কি কাজ তা আমরা বুঝি না। রান্না যদি উৎপাদনের

কাজ না হয়, তবে ছুতারের কাজ কি উৎপাদনের কাজ? ছুতার কী করে? কাঠ থেকে নতুন-নতুন জিনিস তৈরি করে। ঠিক তেমনি মায়েরাও আটা থেকে রুটি তৈরি করে। আর যদি একমাত্র নতুন জিনিস সৃষ্টির নামই উৎপাদন হয়, তাহলে ত ব্রহ্মা ছাড়া আর কেউই উৎপাদক নয়। কৃষক ঈশ্বরসৃষ্ট বীজ জমিতে বপন করে। আর তার বহুগুণ বেশী যে শস্য সে ফিরে পায় তা ত ঈশ্বরেরই সৃষ্টি। কাঠের চেয়ার করা, চামড়ার জুতা তৈরি করা প্রভৃতি সবই এক জিনিসকে অন্য জিনিসে রূপান্তরিত করা। আমরা নতুন জিনিস সৃষ্টি করতে পারি না। আমরা নিজেরাই সৃষ্ট। আমরা কৃতি, কর্তা নই। কাঠের চেয়ার বানানো যেমন কাঠের রূপান্তর, তেমনি গমের আটা, আটার রুটি বানানোও গমের রূপান্তর। একে কি তখনই আমরা উৎপাদন বলে বুঝব যখন মা-বোনেরা বলবেন, 'আমাদের যদি রোজ এতো করে মজুরী দাও, তবেই আমরা রুটি বানাব'?

মার সেবা

মা সন্তানদের সেবায় দিনরাত অতিবাহিত করেন। কেউ যদি তাঁর সেবার রিপোর্ট চায়, তবে মা কী রিপোর্ট দেবেন? মা এত সেবা করেন যে তার কোন রিপোর্ট দেওয়া সম্ভব নয়। তিনি এই কয়টি কথায় রিপোর্ট দিয়ে দেবেন—'আমি ত কোন সেবাই করিনি।' মার রিপোর্ট এত ছোট কেন? এর কারণ আছে। মার অন্তরে সন্তানের জন্য এত প্রেমভাব থাকে যে, সন্তানের জন্য সবকিছু করেও তাঁর মনে হয় কিছুই করা হয়নি। সেবা করতে গিয়ে তাঁকে কিছু কম কষ্ট সহ্য করতে হয় না, কিন্তু সে কষ্ট তার কাছে কষ্ট বলে মনে হয় না। আমরাও যদি আমাদের সামনে কোন মহৎ কল্পনা রেখে কাজ করতে থাকি, তবে 'এখনও কিছু করিনি'—এ রকমই আমাদের মনে হবে। ইন্দ্রিয় নিগ্রহ করতে হবে—এরকম এক বাক্য যদি আমাদের সামনে থাকে, তবে কেবল হিসেব করতে থাকব যে

এতদিন গেল অথচ কোন ফল দেখা যাচ্ছে না। কিন্তু যদি কোন বৃহৎ কল্পনা রূপায়িত করার জন্য আমরা ইন্দ্রিয় নিগ্রহ. করি, তাহলে 'আমরা এ করছি, ও করছি' বলে কোন রকম 'কর্তরি প্রয়োগ' তাতে থাকে না। তখন 'নিগ্রহ হয়ে যায়' এমন 'কর্মণি প্রয়োগ' এসে যায়।

সর্বোদয়-বিচারের বীজ

মা এ কথাই বলেন, 'যে পর্যন্ত আমার বাচ্চারা জল না পাচ্ছে, সে পর্যন্ত আমার নিজের জলের দরকার নেই।' ধরুন, তাঁর কাছে মাত্র এক গ্লাস জল আছে। তিনি সকলের তৃষ্ণা দূর না করে নিজের তৃষ্ণা নিবারণ করবেন না। তাঁর জন্যে যদি এক বিন্দু জলও অবশিষ্ট না থাকে, তবু তিনি আন্তরিক সুখ অনুভব করবেন। এটাই মার মাতৃত্ব। আপন সন্তানদের মধ্যে সীমাবদ্ধ হলেও মার এরূপ ভাবনাই সর্বোদয় ভাবনা। এ বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই যে, তাঁর ভাবনা বা সমাজ সবকিছুই তাঁর নিজের সন্তান পর্যন্তই সীমিত। তাই তাঁর সর্বোদয়ের ভাবনাও সীমিত।

মাতৃশক্তির গুরুত্ব

শাস্ত্র আগে বলেছে—'মাতৃদেবো ভব,' পরে বলেছে—'পিতৃদেবো ভব'। অর্থাৎ প্রথমে মার স্থান। এক ঋষি তাঁর জ্ঞান কিরূপ তা বলতে গিয়ে বলেছেন—'মাতৃবান্ পিতৃবান্ আচার্যবান্ পুরুষো বেদ।' অর্থাৎ মাতা, পিতা ও গুরু যেমন বলে থাকেন এ জ্ঞান তেমন। এখানেও প্রথমেই মার উপর জ্ঞানদান করার গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে। জ্ঞানদেবের অভঙ্গ খুবই প্রসিদ্ধ। শিশুকে দোলনায় শুইয়ে দোলাতে-দোলাতে তাকে বেদান্ত শেখানো হয়েছিল! মা এত শক্তিধারিণী। কাজেই মায়েদের স্থান প্রথমেই হওয়া উচিত। এঁদের রাজত্ব ঘরে—এ ঠিকই আছে; কিন্তু বাইরেও এঁদের প্রভাব থাকা চাই। যাঁদের

জীবন এভাবে প্রভাবিত হয়েছে, তাঁদের জীবনে এক অপূর্ব দীপ্তি ফুটে উঠেছে। শিবাজী, সানে গুরুজী এরা শৈশবে মার কাছ থেকেই জ্ঞান লাভ করেছিলেন আর তা সারা জীবনের জন্য তাঁদের হৃদয়ে বাসা করে নিয়েছিল। শ্রুতিকে শংকরাচার্য 'মাতা' বলেছেন। আমরাও জ্ঞানেশ্বরকে 'জ্ঞানোবা মাউলী' (জ্ঞানদেব মা) বলি। মারাঠীতে গুরুকেও মাউলী' (মা) বলা হয়। জ্ঞানদেব ত আরো এগিয়ে গেছেন :

'জেথ প্রিয়াচী পরিসীমা তেথ ভেটে মাউলী আত্মা।'

যেখানে সংসারের আসক্তি শিথিল হবে, সেখানে আত্মা-মার সাক্ষাৎ লাভ হবে।

রাঙ্গরী (বীড়),
৮ ৭. ৫৮.

গ্রামের মা হতে হবে

ঘরে প্রেমের যে পরিবেশ থাকে গ্রামেও সে পরিবেশ সৃষ্টি করা যেতে পারে। আমি বোনদের বলতে চাই যে, তাঁরা যদি গ্রামের মা হতে পারেন তাহলে গ্রাম গোকুলে পরিণত হয়ে যাবে। তাহলে এই পৃথিবীতে বৈকুণ্ঠের প্রতিষ্ঠা হবে। যেখানে প্রেম সেখানেই বৈকুণ্ঠ। বৈকুণ্ঠ কোনও একটি বিশেষ স্থানে নেই। তা কেবল কৈলাসেই নয়, আমাদের এখানেও আছে। গ্রামে যদি প্রেমপূর্ণ আবহাওয়ার সৃষ্টি হয়, তবে সকলের জীবন পবিত্র হবে এবং গ্রাম গোকুলে পরিণত হবে। মায়েরা একথা সহজে বুঝতে পারবেন। একথা বুঝে নিতে তাঁদের একটুও অসুবিধা হবে না। কিন্তু তাঁদের ত সভায়ও আসতে দেওয়া হয় না। পর্দার আড়ালে কয়েদীর মতো তাঁদের আটকে রাখা হয়। এর ফল এই দাঁড়ায় যে তাঁদের মন সংকীর্ণ হয়ে যায়। বস্তুতপক্ষে তাঁদের মন ছোটো হয় না, কিন্তু ঘরের সংকুচিত পরিবেশে থাকার দরুন তাঁরা কেবল নিজেদের ছেলেপুলের কথাই ভাবেন। মায়েদের কাজ যখন জ্ঞানদীপ্ত হবে, তখন আর এ অবস্থা থাকবে না।

নারী ও পুরুষ যদি একসঙ্গে অগ্রসর হয়, তবেই সমাজের গাড়ী চলবে। দুইয়ের মোক্ষের অধিকার সমান। মোক্ষে, জ্ঞানে, বিজ্ঞানে এবং যদি চান ত ধনসম্পদেও মেয়েদের অধিকার থাকা উচিত। নারী ও পুরুষের উভয়েরই সমান হওয়া চাই। মায়েদের যথার্থ জ্ঞান লাভ হলে তাতে সমগ্র সমাজ যত নিরাপদ হবে এমন আর অন্য কিছুতে হবে না।

মা শ্রেষ্ঠ গুরু

শিক্ষা সম্বন্ধে যেভাবেই ভাবি আমার মনে হয় বর্তমান শিক্ষা যান্ত্রিক ছাঁচে ঢালা। মনে হয় এর থেকে অশিক্ষাই ভালো। আপনারা কি মনে করেন যে, আজ যে-শিক্ষা চলেছে তা যদি বন্ধ হয়ে যেত, তবে মা-বাবা ছেলেপুলেদের মানুষ হওয়ার শিক্ষা দিতেন না? চাষবাসের জ্ঞান, সদাচার ও সদ্ব্যবহারের জ্ঞান দিতেন না? শিশুকে সকলের আগে মা-বাবা শিক্ষা দেন, পরে তার চেয়ে একটু বেশী শিক্ষা দেন গুরু। কাজেই গুরুদের এরজন্য অহংকার করার কিছু নেই। মা দেন প্রথম নম্বরের শিক্ষা। কিন্তু সরকারী শিক্ষাদপ্তর থেকে যে-শিক্ষা পাওয়া যায়, তাকে কোনো নম্বরেই ফেলা যায় না, কারণ তা ত ছাঁচ।

যতদিন মা-বাবার অস্তিত্ব থাকবে, আর মা-বাবা ছাড়া তো শিশুর জন্ম হয়ই না, ততদিন শিশুদের জ্ঞানলাভ হবেই। ঈশ্বরের পরিকল্পনাই এমন যে, তিনি যেমন শিশুকে মুখ দেন, তেমনি মার স্তনে দুধেরও সৃষ্টি করেন। শিশুর ক্ষুধা লাগার সঙ্গে সঙ্গে মাকেও খাওয়াবার প্রেরণা দেন। এইভাবে শৈশবকাল থেকে মার মাধ্যমে শিশুকে প্রেমের শিক্ষা দেওয়া হয়ে থাকে। শিশুকে ভাষা শেখাবার জন্য কত কোটি টাকা সরকার খরচ করে! কিন্তু মা তো দুধ খাওয়াতে খাওয়াতে শিশুকে মাতৃভাষা শেখান। সারা দুনিয়ার শিশু মার কাছেই ভাষা শেখে। মা শিশুকে বলেন, 'ঐ দেখ চাঁদ।' শিশু তা শোনে। মা আবার তাকে প্রশ্ন করেন, 'কোথায় চাঁদ, বল্।' তিনি পরীক্ষা

নেন। শিশু আঙুল দিয়ে দেখায় চাঁদ কোথায়। পরে শিশু তা বলতে শুরু করে—চ, চ, চ, ন, দ; তারপর 'চাঁদ, চাঁদ' বলে। অর্থাৎ প্রথমে বস্তু গ্রহণ করে, পরে বলে। এই যে সব জ্ঞান, ভাষা শেখার জ্ঞান, এ কি বিদ্যালয়ের শিক্ষা থেকে কম? দু-আড়াই বছরে শূন্য অবস্থা থেকে শিশুর মধ্যে জ্ঞান সৃষ্টি করা হয় আর মা-ই এ সব করেন। শিক্ষাবিদ্‌রা তাঁদের অভিজ্ঞতা ও নিরীক্ষণ থেকে বলেন যে, শিশুদের প্রথম দু-এক বছরে যত জ্ঞান লাভ হয় পরবর্তী সারা জীবনেও তত হয় না। তাই দুনিয়ার সমস্ত লোক স্বীকার করে যে, মায়েরা যদি সংস্কৃতিসম্পন্না হন, তবেই দুনিয়া বাঁচবে। এবং এই জন্যই মা সর্বপ্রথম ও শ্রেষ্ঠতম গুরু। মার স্নেহ সবাই পেয়ে থাকে।

কস্তুরবা দর্শন,

১৫, ৮, ৫৪,

মা ও সুনাগরিক

ভারতবর্ষে ধর্মরক্ষা নারীরাই বেশী করেছেন। বাসনাসক্তের সংখ্যা পুরুষদের মধ্যে যত দেখা যায়, নারীদের মধ্যে তার চেয়ে অনেক কম দেখা যায়। মেয়েরা সমাজে সদাচার বাঁচিয়ে রেখেছেন, এই জন্যই শিশুদের ভার তাঁদের উপর পড়ে। শিশুদের সুঅভ্যাস শিক্ষা দেওয়া ও তাদের পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন রাখার দায়িত্ব মায়েদের। তাঁরা যদি নিজ-নিজ সন্তানদের সচ্চরিত্র করে গড়ে তোলেন তবে দেশে উত্তম নাগরিকের সৃষ্টি হবে। শিশু ত শ্রেষ্ঠ সম্পদ। এর চেয়ে বড়ো কোন্ ধন আছে? কৌশল্যার গর্ভে জন্ম নিয়েছিলেন শ্রীরামচন্দ্র আর দেবকীর গর্ভে শ্রীকৃষ্ণ। যত সৎপুরুষ জন্ম গ্রহণ করেছেন তাঁদের মায়েরা সবাই ধর্মপরায়ণা ছিলেন। যে-ঘরের নারীরা ঈশ্বরভক্ত, সত্যাশ্রয়ী ও স্নেহময়ী, সে-ঘরে মহাপুরুষের জন্ম হয়। দুনিয়ার লোক একথা জানে। কাজেই মায়েদের কাছে বিরাট শক্তি পড়ে আছে।

সর্বোদয়,

এপ্রিল '৫১

ব্রহ্মচর্য

ব্রহ্মচর্যকে ভারতীয় সংস্কৃতির এক মূলীভূত বস্তু বলা যেতে পারে। যদিও দুনিয়ার প্রায় সব সমাজে এর বিচার ও প্রয়োগ হয়েছে, তবু ভারতীয় সাহিত্যে ও সংস্কৃত ভাষায় ব্রহ্মচর্য যেমন স্থান পেয়েছে এবং তাতে যত গভীর চিন্তনের সন্ধান পাওয়া যায়, এমন আর অন্য কোথাও নজরে পড়ে না।

ব্রহ্মচর্যের অর্থ

'ব্রহ্মচর্য' শব্দের তাৎপর্য হচ্ছে ব্রহ্মের খোঁজে নিজের জীবন সক্রিয় রাখা। এর মধ্যে আমরা কোন 'নিগেটিভ্' (নেতিবাচক) ভাবের পিছনে ছুটি না বরং 'পজিটিভ্' (অস্তিবাচক) বস্তুর সন্ধান করি। কোন বিশেষ শিক্ষা থেকে পানাহারে সংযম আসুক—-এরমধ্যে এতটুকুই নয়, বরং একটি প্রত্যক্ষ অনুভূতি উপলব্ধি করার কথা রয়েছে। একেই ব্রহ্মচর্য বলব। 'ব্রহ্মচর্যে'র অর্থ হচ্ছে সর্বাপেক্ষা বিশাল ধ্যেয় —পরমেশ্বরের সাক্ষাৎলাভ করা। এর থেকে একটুও কম হলে চলবে না। এত বিশাল ও ব্যাপক আদর্শ এটি।

ব্রহ্মচর্যের সাধনা কেন ?

যে কোন বড়ো লক্ষ্যের জন্য ব্রহ্মচর্যের সাধনা করা যায়, ভীষ্ম যেমন তাঁর পিতার জন্য ব্রহ্মচর্যের ব্রত নিয়েছিলেন এবং সারাজীবন তা নিষ্ঠার সঙ্গে পালন করেছিলেন। এভাবে চলতে গিয়ে পরে তিনি এর আধ্যাত্মিক গভীরতায় পৌঁছে যান। ভীষ্ম আত্মনিষ্ঠ বিরাট পুরুষদের একজন। কিন্তু তিনি প্রথমে যা আরম্ভ করেছিলেন, তা ব্রহ্মপ্রাপ্তির জন্য করেননি। তাহলেও তাঁর লক্ষ্য বড়োই ছিল। পিতার সুখের জন্য ত্যাগ করেছিলেন এবং পরে তিনি তার অর্থ গভীরভাবে বুঝেছিলেন। গান্ধীজীও প্রথমে ব্রহ্মচর্য আরম্ভ করেন সমাজসেবার জন্য। দক্ষিণ আফ্রিকায়

কাজ করার সময় তিনি বুঝেছিলেন সেবার কাজ কঠিন। সেবাও চলতে থাকবে, পরিবারবৃদ্ধিও হতে থাকবে, ছেলেপুলেও হতে থাকবে—তা হয় না। তাই তিনি ঠিক করলেন, সমাজসেবার জন্য ব্রহ্মচর্য পালন করতে হবে। কিন্তু তাঁর বিচার পরে এর গভীরতায় পৌছায়। এভাবে গান্ধীজীও প্রথমে যা আরম্ভ করেছিলেন তা অন্তিম উদ্দেশ্য থেকে নয়, বরং সমাজসেবার উদ্দেশ্য থেকেই আরম্ভ করেছিলেন। এও এক বিশাল ধ্যেয়। আর এই থেকেই তাঁর বিচার বিকাশলাভ করতে থাকে। এভাবে কোন ব্যাপক ও বিশাল লক্ষ্যের জন্য কাজ আরম্ভ করলে ক্রমে তা আরও এগিয়ে যেতে থাকে।

অন্যসব কাজের জন্যও ব্রহ্মচর্য পালন করা যায়। কিছুলোক 'সায়েন্স'-এর (বিজ্ঞানের) জন্যও ব্রহ্মচর্য পালন করেন। তাঁরা 'সায়েন্স'-এর জন্য এত একনিষ্ঠ হয়ে যান যে, সে-অবস্থায় গৃহস্থাশ্রমে প্রবেশ না করা উচিত বলে মনে করেন। এর জন্য ঠিক ভাবে ব্রহ্মচর্য পালন করে থাকেন। বিজ্ঞানে তন্ময়তার এক বিরাট শক্তি রয়েছে। কোনও এক লক্ষ্যে তন্ময় হয়ে যাও, রাতদিন তারই চিন্তা কর ত ব্রহ্মচর্যও এসে যাবে। এ ঠিক যে, পূর্ণ ব্রহ্মচর্য এ নয়। কারণ, ব্রহ্মনিষ্ঠা না এলে তাকে ব্রহ্মচর্য বলা যায় না।

সর্বেন্দ্রিয় সংযম

ব্রহ্মচর্যে কঠোর সাধনার প্রয়োজন। কেবল একটি ইন্দ্রিয়েরই সংযম—ব্রহ্মচর্যের অর্থ যদি এতটুকুই ধরে নেওয়া হয়, তবে বিপদের সৃষ্টি হবে। সমস্ত ইন্দ্রিয়কেই অধীনে রাখা, বশে রাখা এর অর্থ। সুতরাং ব্রহ্মচর্যে দু'টি জিনিস রয়েছে: (১) ধ্যেয় উত্তম হবে এবং তা বিকশিত হতে হতে ব্রহ্মের উপাসনা পর্যন্ত পৌছাবে; (২) সমস্ত ইন্দ্রিয় ও মন বশে থাকবে। একথার তাৎপর্য এ নয় যে, ইন্দ্রিয় ও মনকে দাবিয়ে রাখতে হবে। এগুলিকে ঠিক পথে নিয়ে যাওয়াই হচ্ছে ব্রহ্মচর্যের কথা। যদি দাবিয়ে রাখার খেয়াল থেকে কাজ চলে, তবে তাতে মানুষের বিকাশ হবে না। এ 'নিগেটিভ্'

(নেতিবাচক) কথা। কাজেই সমস্ত ইন্দ্রিয়ের যদি উচিত ব্যবহার হয়, ঠিকঠিক নিয়মন হয়, তবে সাধকেরও উন্নতি হয়।

প্রতি আশ্রমে ব্রহ্মচর্য

ভারতীয় ধর্মবিচারে সুব্যবস্থিত আয়োজন এই দৃষ্টি থেকে করা হয়েছিল। সর্বাগ্রে গুরুনিষ্ঠা। সেইসঙ্গে ব্রহ্মচর্যকে জুড়ে দেওয়া হয়েছে। প্রথম আশ্রম, ব্রহ্মচর্যাশ্রম। তারপর দ্বিতীয় আশ্রম গৃহস্থাশ্রম। এতে স্বামী-স্ত্রীর একের অন্যের প্রতি নিষ্ঠা থাকবে। ব্রহ্মচর্যকে এখানেও জুড়ে দেওয়া হয়েছে। তারপর বানপ্রস্থাশ্রম। এখানে ব্রহ্মচর্য চলবে সমাজনিষ্ঠার সঙ্গে। তারপর অন্তিম আশ্রম সন্ন্যাস-আশ্রম। সন্ন্যাস-আশ্রমে ব্রহ্মনিষ্ঠা আসে। এখানেও ব্রহ্মচর্য রয়েছে। এভাবে প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত ব্রহ্মচর্যের বিচার রাখা হয়েছে। বিচার থেকে পোষণ পাওয়া যায়। কাজ বিচার ছাড়া হয় না। আমি পায়ে হেঁটে ঘুরে বেড়াই। এতে কষ্ট ত হয়ই। কিন্তু এক উদ্দেশ্য নিয়ে ঘুরছি। তাই কষ্টকে কষ্ট বলে মনে হয় না। এখানে কষ্ট 'তপ' হয়ে গেছে। তা না হলে 'তাপ' হত। বিচারহীন কষ্টে তাপ হয়। কিন্তু বিচার পূর্বক কষ্ট করলে তা হয় আনন্দময়। এইজন্যই একে 'তপ' বা তপস্যা বলা হয়।

জীবনের বুনিয়াদী নিষ্ঠা

ব্রহ্মচর্যাশ্রমে গুরুনিষ্ঠার কথা ছিল। অধ্যয়ন করতে হত। তার সঙ্গে ব্রহ্মচর্যের কথা এসে পড়ে। এভাবে জীবনের বুনিয়াদ গড়ে ওঠে। ব্রহ্মচর্য বুনিয়াদী নিষ্ঠা। আজকাল 'বুনিয়াদী শিক্ষা'র কথা বলা হয়ে থাকে। এর অর্থ—যা জীবনভর কাজে লাগবে, যেমন শিল্প ইত্যাদি। কিন্তু ব্রহ্মচর্য এ সব থেকে অনেক বড়ো গুণ। এ এমন গুণ যা থেকে নিয়ত সাহায্য মেলে এবং জীবনের সর্বপ্রকার বিপদে সহায়তা পাওয়া যায়। বুনিয়াদী শিক্ষায়

এজন্যই এমন ব্যবস্থা থাকা দরকার যাতে ছোটো বয়স থেকেই ব্রহ্মচর্যে নিষ্ঠা আসে।

অধ্যয়নকাল শেষ হওয়ার পর গৃহস্থাশ্রম। এতে স্বামী-স্ত্রীর পরস্পরের প্রতি নির্ভরতা এবং কেবল সন্তানের জন্যে মিলন—এ কথা আসে। আজকাল তা হয় না। তবে লোকে এ বিচার বুঝে নিলে হতে পারে। এভাবে গৃহস্থাশ্রমের আধারও ব্রহ্মচর্য। সন্তানবাসনার সঙ্গে আসে সন্তানসেবার কথা এবং সে সঙ্গে সকলের ধর্ম সন্তানের পূজা করা। আবার অতিথি সেবাও রয়েছে। ব্রহ্মচর্যের জন্যে এসব সাধন প্রয়োজন। গৃহস্থাশ্রম কয়েক বছরের জন্য। এভাবে প্রথমে ব্রহ্মচর্যাশ্রম; পরে কিছুকালের জন্যে গৃহস্থাশ্রম এবং সেখানেও ব্রহ্মচর্যের জন্য অবকাশ; তারপর বানপ্রস্থাশ্রম। আগে আমাদের দেশে এরকম পরিকল্পনা করে কাজ করা হত। কিন্তু দুঃখের বিষয় এখন এ জীবনচর্যা ভেঙ্গে পড়েছে।

ভারতীয় ধর্মের যেসব বিশেষ জিনিস আগে ছিল, এখন তা নেই। এখন ভক্তিমার্গ কিছু রয়েছে আর তা ত সব ধর্মেই আছে। এও ভালো। একে অবলম্বন করেই আমরা এগিয়ে যেতে পারব। কিন্তু ভক্তিমার্গ ত এক 'মিনিমম প্রোগ্রাম' (ন্যূনতম কার্যক্রম)। আধ্যাত্মিক জীবনের 'বেসিস্' (আধার)। এই বুনিয়াদের উপর অবশিষ্ট গোটা বাড়ি গড়ে তুলতে হবে। হিন্দুধর্মের কাঠামো ত আজ ধ্বসে গেছে। নতুন করে হিন্দুধর্মের স্থাপনা করতে হবে। আর এতে খুব বড়ো বিচার ব্রহ্মচর্য।

ইসলামের আদর্শ

ইসলাম ধর্মের বিচারে গৃহস্থধর্মই পূর্ণ আদর্শ। বাকী সব গৌণ। এমনিতে ভগবান যীশু ত শ্রদ্ধাভাজনই ছিলেন, তিনি ব্রহ্মচারী ছিলেন। কিন্তু তাঁর জীবনকে পূর্ণ জীবন বলা যাবে না। মহম্মদের আদর্শ পূর্ণ। তিনি গৃহস্থ ছিলেন। ব্রহ্মচারীকে 'এক্সপার্ট' (বিশেষজ্ঞ) বলা যায়। বিশেষজ্ঞ একাঙ্গী হন, সমাজে

তাঁরও প্রয়োজন আছে। কিন্তু এইভাবে যিনি শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত ব্রহ্মচারীর জীবন যাপন করেন, তাঁর আদর্শ পূর্ণ নয়। গৃহস্থই পুরুষোত্তম, পূর্ণ আদর্শ। স্ত্রী ও পুরুষ উভয়ের জন্যই গৃহস্থধর্ম পূর্ণ আদর্শ। মুসলমান ধর্মের চিন্তাধারা এই ভাবে গড়ে উঠেছে।

বৈদিক আদর্শ

বৈদিক ধর্মে অন্য কথা রয়েছে। এখানে ব্রহ্মচারীকে আদর্শ মানা হয়েছে। মাঝখানে যে গৃহস্থাশ্রম আসে, তা বাসনাকে নিয়ন্ত্রণ করার জন্য। এ ভাবে নিয়ন্ত্রণের এক সামাজিক যোজনা করা হয়েছিল, যাতে মানুষ উপরের সিঁড়িতে সহজে উঠতে পারে। কিন্তু ব্রহ্মচর্য ছিল সর্বোত্তম আদর্শ।

নারী-পুরুষ ভেদ

নারী-পুরুষের ভেদ আসে মধ্যবর্তীকালে, যখন থেকে হিন্দুধর্মে দুর্দশার আরম্ভ। ব্রহ্মচর্যে অধিকার কেবল ছেলেদের থাকল, মেয়েদের নয়। মেয়েদের গৃহস্থাশ্রমী হতেই হবে এরূপ মেনে নেওয়া হল। কেউ যদি গৃহস্থাশ্রমী না হত, তবে তা অধর্ম হত। অধর্মের আরোপ সহ্য করেও কিছু এমন মেয়ে বেরুলেন, যাঁরা সমাজের বিরুদ্ধে দাঁড়িয়ে ব্রহ্মচারিণী হলেন। যেমন—মীরাবাঈ, মহারাষ্ট্রের মুক্তাবাঈ। সমাজের পক্ষে এঁদের উপর অধর্মের আরোপ করা হয়েছিল। কিন্তু তাঁরা নিজেরা ব্রহ্মচর্যে দৃঢ় প্রতিজ্ঞ ছিলেন। সমাজ তাদের সে অধিকার স্বীকার করেনি।

দোষের সংশোধন

এমনি ভাবে খুব বড়ো এক দোষের উৎপত্তি মধ্যবর্তীকালে হয়েছিল। একালে তার সংশোধন হওয়া প্রয়োজন। অধিকার দিলেও তা পালন করার লোক কম হবে। কিন্তু কম হোক আর বেশী হোক, ব্রহ্মচর্যে মেয়েদের অধিকারই থাকবে না—এ অন্যায়। এতে আধ্যাত্মিক 'ডিসেবিলিটি'র

(অযোগ্যতার) সৃষ্টি হয়। কোন ব্যবহারিক অযোগ্যতা সংস্কার করা সম্ভব। কিন্তু আধ্যাত্মিক অযোগ্যতা খুবই দুঃখের কথা। ভারতে মাঝখানে যে তেজহীনতা দেখা দিয়েছিল তার এ-ও এক কারণ যে, ব্রহ্মচর্যে মেয়েদের অধিকার ছিল না।

বাসনার যুক্তি ভুল

মেয়েদের কাম-বাসনা বেশী অনেক সময় এরকম বলা হয়ে থাকে। কিন্তু এ অনুমান ভুল। মেয়েদের প্রসব যাতনা ভুগতে হয়, শিশুর জন্য অনেক কষ্টভোগ করতে হয়। কাজেই যেখানে এত কষ্ট, সেখানে তারজন্য তাঁদের মনে অধিক বাসনা থাকবে—এ সম্ভব বলে মনে হয় না। একদিন আমি একটি মন্দির দেখতে গিয়েছিলাম সেখানে মা দেবকীর একটি চিত্র ছিল। প্রসব-বেদনার চিত্র। তা দেখে আমার মনে হল, প্রসব-বেদনা এত কষ্টকর জানলে ভগবান হয়ত জন্মগ্রহণই করতেন না। কয়েকবার মনে হয়েছে, 'আমার শরীর ত দুর্বল। আমি যদি মেয়ে হতাম আর এমন অবস্থায় ছেলেপুলে হত, তবে কি করে বাঁচতাম!' এ কথা বলা যেতে পারে যে, মেয়েদের সন্তানের ইচ্ছা থাকে। তাঁদের মাতৃত্বের কামনা আছে। কাজেই এমন হতে পারে যে, মেয়েদের প্রথম সন্তানের ইচ্ছা থাকে। একেবারে অপুত্রক থাকা পুরুষদের চেয়ে মেয়েদের পক্ষে বেশী কঠিন বলে মনে হয়। কিন্তু একটি শিশু হবার পর মেয়েদের হয়ত আর বাসনা থাকে না। কারণ, সন্তান হবার সময় তাঁদের খুব কষ্টভোগ করতে হয়। এ আমার নিজের বিশ্লেষণ। কতদূর ঠিক জানি না।

এ সব বলার তাৎপর্য এই যে, মেয়েদের সম্বন্ধে একটি ভ্রান্ত ধারণা করা হয়েছে—তাঁদের কাম-বাসনা বেশী। এই ভুল ধারণার জন্যই মেয়েদের উপর নিয়ন্ত্রণ রাখা হয়। ভারতে এর ফল এই দাঁড়িয়েছে যে, কারুর উপর কোন অত্যাচার হলে মেয়েরাই ছেলেদের বাঁচিয়ে দেন। এ সম্বন্ধে

একটু গভীরভাবে চিন্তা করলে দেখা যাবে, মেয়েদের মনে ছেলেদের জন্যে অশ্রদ্ধার ভাব রয়েছে, অনাদর রয়েছে। ছেলেরা কোন অন্যায় করল ত তা খুব বড়ো কথা হল—এ তাঁরা মনে করেন না। যদি কোন মেয়ে বিড়ি টানে, তবে তা খারাপ বলে মনে করা হয়। কিন্তু ছেলেদের বেলায় তা মনে করা হয় না। আমারও মেয়েদের বিড়ি-সিগারেট টানতে দেখলে অদ্ভুত লাগে। কিন্তু এমন কেন হবে? নারী-পুরুষ ত সমানই।

মেয়েদের অপাত্রতা ঘুচুক

তাহলেও মেয়েদের জন্য ভারতে আধ্যাত্মিক উচ্চ ভাবনা আছে এবং মেয়েদের মনেও সে-ভাবনা রয়েছে। এই জন্যই কোন ব্যভিচারী পুরুষ দেখা দিলে মেয়েরাই তাকে ক্ষমা করে দেন। তাঁরা বলেন, 'আরে, পুরুষগুলো তো এমনই হয়ে থাকে।' একে মেয়েদের 'সুপিরিয়রিটি কম্প্লেক্স্' (অহম্মন্যতা) বলা যেতে পারে। কিন্তু মেয়েদের পক্ষে যে জিনিস খারাপ বলে ধরা হয়েছে তাকে দূর করতে হবে। এ ছাড়া সমাজের মুক্তি নাই। আমি ত অনেকবার বলেছি, যেপর্যন্ত শঙ্করাচার্যের মতো কোন নারী মেয়েদের মধ্য থেকে পুরানো শাস্ত্রের ভুলগুলি শুধ্রে না দেবেন এবং নতুন শাস্ত্র সৃষ্টি না করবেন সে পর্যন্ত তাঁদের মুক্তি আসবে না। কিন্তু শাস্ত্রের ভুল ত তিনিই দেখাতে পারেন, যিনি অত্যন্ত তেজস্বী, বৈরাগ্যশীল ও জ্ঞাননিষ্ঠ। একমাত্র তখনই অপাত্রতার আরোপ ঘুচে যেতে পারে এবং ব্রহ্মচর্য পালনে মেয়েদের যে বাস্তবিকই অধিকার রয়েছে, তা তাঁরা লাভ করতে পারেন। কিন্তু সমাজে এখনও ব্রহ্মচারিণীর নিন্দা হয়ে থাকে।

অমৃতের নামে বিষ

আমি দেখেছি শৃঙ্গার সাহিত্য থেকে বিষয়-বাসনায় প্রলুব্ধ হয়ে মানুষ যত অধঃপাতে যেতে পারে, তার চেয়েও বেশী নীচে যেতে পারে ঐ সাহিত্য পড়লে যাতে বাসনা থেকে বাঁচবার কথা লেখা রয়েছে। এত খারাপ ঐসব সাহিত্য!

মাতৃত্বের অনুভূতি ব্রহ্মচারীর রক্ষাকবচ

হওয়া ত এই চাই যে ব্রহ্মচারীর কাছে যদি কোন স্ত্রীলোক আসেন, তবে তাঁকে দেখে ব্রহ্মচারী বেশী পবিত্র ও সুরক্ষিত অনুভব করবে। কোন স্ত্রীলোক কাছে এলে, মা-ই এসে গেছেন আমার এরূপ মনে হয়। খুবই নিরাপদ লাগে। কারণ, মা পাশে দাঁড়িয়ে আছেন ত, অমঙ্গল আসবে কী করে? মেয়েদের কাছে সকল ব্রহ্মচারীর এমন নিরাপদ মনে হওয়া চাই। স্ত্রীলোকের সম্পর্ক থেকে দূরে থাকতে হবে—এ ভাবনা ভুল। এর থেকে অনর্থক এক কৃত্রিম ব্যবধানের সৃষ্টি হয়ে থাকে।

মুসলমানদের পর্দা-প্রথা দেখুন। এতেও সেই একই ব্যাপার। হিন্দুরা মেয়েদের উপর অপাত্রতার বোঝা চাপিয়েছেন। এ সবই ভুল। কিন্তু জৈনদের মধ্যে নারী-পুরুষে ছোটো-বড়ো ভেদভাব নেই। খ্রীষ্টানদের মধ্যে যাঁরা ক্যাথলিক তাঁরা নারীপুরুষকে সমান দৃষ্টিতে দেখেন। কিন্তু প্রোটেষ্টাণ্টরা এ বিষয়ে অনেকটা মুসলমানদের মতো। তাঁদের কাছে ব্রহ্মচর্য এক অসম্ভব বস্তু এবং গৃহস্থাশ্রমই আদর্শ। অন্যদিকে ক্যাথলিকদের মধ্যে ভাই-বোনেরা সকলেই ব্রহ্মচারী হতে পারেন। এই জন্যই সাধনার ব্যাপারে এক সামাজিক বিষয় এসে যায়—মেয়েদের কোন্ দৃষ্টিতে দেখা হবে।

ব্রহ্মচারীর দৃষ্টি

মেয়েদের দেখতেই মানা—ব্রহ্মচারীর এমন ভাবনা না থাকা চাই। রামায়ণের একটি কথা মনে এল। প্রভু রামচন্দ্র সীতার গয়না দেখিয়ে লক্ষ্মণকে জিজ্ঞেস করলেন, 'তুমি এ গয়নাগুলো চিনতে পার?' রাবণ যখন সীতাকে নিয়ে যাচ্ছিলেন তখন লঙ্কা যাওয়ার পথে সীতা তাঁর গয়নাগুলি একটি-একটি করে ফেলে ফেলে যাচ্ছিলেন, যাতে রামচন্দ্র বুঝতে পারেন কোন্ রাস্তা দিয়ে সীতাকে নিয়ে যাওয়া হয়েছে। প্রশ্নের উত্তরে লক্ষ্মণ বললেন :

নাহং জানামি কেয়ূরে নাহং জানামি কুণ্ডলে।
নূপুরে ত্বভিজানামি, নিত্যং পাদাভিবন্দনাৎ ॥

—'কেয়ূর ও কুণ্ডল, যা উপরাংশের গয়না, তা ত আমি চিনি না। কিন্তু নূপুর চিনি। কারণ, রোজ সীতাদেবীর পাদ-বন্দনার সময় আমি ঐ নূপুর দেখেছি।

লক্ষ্মণ চরণাকৃতির পূজারী

একদিন সবরমতী-আশ্রমে এ কথার উপর আলোচনা চলছিল। বাপু ত ছিলেন ক্রান্তিকারী। তিনি বললেন, 'লক্ষ্মণের এ উত্তর আমার ভালো লাগেনি।' আমাকে জিজ্ঞেস করলেন, 'এ সম্বন্ধে তোমার মত কি? তুমি ত শাস্ত্র ভালো জানো।' আমি বললাম, 'লক্ষ্মণ ব্রহ্মচারী বলে সীতার মুখ দেখতেন না—এ যদি সত্য হয়ে থাকে, তবে আপনার তা অপছন্দ করা ঠিকই হবে। ব্রহ্মচারী যদি এভাব নিয়ে থাকেন যে, মেয়েদের মুখ দেখবেন না, তবে তা ভুলই। কিন্তু আমার কাছে এর অর্থ অন্যরকম। লক্ষ্মণ সীতার চেহারা দেখতেন না—এখানে সে অর্থ নয়। এখানে রামচন্দ্র লক্ষ্মণকে জিজ্ঞেস করছেন। কাজেই রামও সীতার গয়না চিনতেন না। স্বামী স্ত্রীর গয়না চিনলেন না। তাৎপর্য, কি রাম, কি সীতা—দু'জনেই অনাসক্ত ছিলেন। একজন অন্যজনকে আকৃতিস্বরূপ দেখতেন না, বরং ব্রহ্মরূপে দেখতেন। কিন্তু লক্ষ্মণ ত সীতার চরণ পূজা করতেন, পাদাভিবন্দনা করতেন। উপাসনার দৃষ্টিতে চরণাকৃতি দেখতেন ত তাতে পায়ের গয়নাও এসে পড়ত। গয়নাসহ চরণাকৃতির মূর্তিকেই লক্ষ্মণ উপাসনা করতেন।' বাপু তা শুনে বললেন, 'এ-ই ঠিক। আর যতদূর সম্ভব শাস্ত্রের ঠিক-ঠিক অর্থ করাই দরকার।' সুতরাং ব্রহ্মচারীর মনে যদি এ ভাবনা থাকে যে, সামনে স্ত্রীলোক এলে তাঁকে দেখা ঠিক নয় তবে তাকে ত্রুটি বলতে হবে।

পতিপরিচয়ের দরকার নেই

ছেলেদের নিজেদের মধ্যেও বেশী শারীরিক সম্পর্ক ভালো নয়। সম্পর্ক ত হবে মানসিক। শারীরিক সম্পক এতটুকুই হতে পারে যতটুকু কেবল সেবার জন্য প্রয়োজন। আমি দেখেছি, ছেলেরা অনর্থক বন্ধুদের গলা জড়িয়ে ধরে। এ সব হয়ে থাকে, আমার তা পছন্দ হয় না।

এ বাৎসল্য নয়, ভোগ

একবার কেউ আমার এক বন্ধুর কথা বলছিলেন। বন্ধুটি একটি সুন্দর বাছুর দেখে থাকতে পারেননি, প্রেমের সঙ্গে বাছুরটিকে বুকে তুলে নেন। যিনি একথা বলছিলেন, তিনি আমার সেই বন্ধুটির বাৎসল্যের পরিচয় দেবার জন্যই বলছিলেন। কিন্তু আমি বললাম, 'এতে বাৎসল্যের কি আছে? সুন্দর বাছুর দেখে তুলে নিয়েছেন। বাৎসল্য ত নোংরা বাছুরের বেলাও হওয়া উচিত ছিল। কারণ, প্রেমের সঙ্গে পরিষ্কার করার কাজ করতে বাৎসল্যের প্রয়োজন। তিনি যদি কোন নোংরা বাছুরকে তুলে নিতেন এবং পরিষ্কার করতেন, প্রেমের সঙ্গে পরিষ্কার করতেন, তাহলে সেই প্রেম বুঝতে পারতাম।' কেবল সুন্দর জিনিস দেখে তাকে তুলে নিলে তাতে ভোগই প্রকাশ পায়। এতে সেবার দৃষ্টি নেই। কোনও বাচ্চা যদি ভয় পায়, তবে তাকে তুলে নেওয়া দরকার। তাকে সান্ত্বনা দেওয়া দরকার। কিন্তু গরুর ঐ সুন্দর বাছুরটিকে ত শুধু শুধু তুলে নেওয়া হয়েছিল। ওতে কিভাব ছিল? তবে হাঁ, আমি স্বীকার করি যে, আমার বন্ধুটির মনেও বাৎসল্য ছিল, প্রেম ছিল। কিন্তু এ প্রেমের স্তর নীচু। তাই কেবল সেবার জন্যই শরীরের সংস্পর্শে আসা যেতে পারে। শরীর সম্বন্ধে যে এক সাধারণ নিয়ম রয়েছে, তা কেবল নারী-পুরুষের মধ্যে নয়, পুরুষে-পুরুষে এবং নারীতে-নারীতেও পালিত হওয়া চাই। কেবল নারী-পুরুষের মধ্যে ভেদের দৃষ্টি ভুল।

লিঙ্গভেদ অনাবশ্যক

নারী-পুরুষের মধ্যে যেখানে মুক্ততা বেশী, সেখানে পবিত্রতাও বেশী। মালাবারে ত ভাষাতেও লিঙ্গভেদ নেই। হিন্দীতে 'মৈঁ জাতা হুঁ', 'মৈঁ জাতী হুঁ'—এরকমের অনেক ভেদ রয়েছে। বাংলাভাষাতেও লিঙ্গভেদ নেই। এ খুব ভালো। লিঙ্গভেদ না-থাকার দরুন বাংলা বইয়ের হিন্দী অনুবাদ কঠিন হয়ে পড়ে। কারণ, সেখানে স্ত্রী-পুরুষে প্রেমের যে পবিত্রতা রয়েছে, তা অনুবাদে আসে না। হিন্দীতে লিঙ্গভেদ রয়েছে। প্রকৃতপক্ষে বাংলার অনুবাদই হতে পারে না হিন্দীতে। বাংলায় যে 'ইম্পার্সনাল' (অশরীরী) প্রেম রয়েছে তাকে হিন্দী অনুবাদে আনা যায় না। তবে হাঁ, সংস্কৃতের অনুকরণে বাংলায়ও লিঙ্গভেদ করা হয়ে থাকে। এও করা ঠিক নয়। ক্রিয়াপদে লিঙ্গভেদ নেই, খুব ভালো কথা। বাস্তবপক্ষে এই পৃথকীকরণের কোন প্রয়োজনই নেই। সংস্কৃতের ক্রিয়াপদেও ভেদ নেই। ইংরেজীতে যে 'হিজ্' (তাহার পুং) এবং 'হার্' (তাহার স্ত্রীং) ব্যবহৃত হয়, তাও বাংলাভাষায় নেই। এতে পরিবেশ পবিত্র হয়।

মর্যাদা সকলেরই

নারী-পুরুষের পার্থক্য ত আকৃতিতে। অন্তরের আত্মা এক। মানুষ মেনে নিয়েছে যে, দুইয়ের মধ্যে কিছু ব্যবধান থাকা দরকার। কিন্তু এ কোন সর্বোত্তম ব্যাপার নয়। হওয়া ত চাই, একের অন্যের কাছে খোলা মনে আসা। শরীর-সম্পর্ক সম্বন্ধে সকলে এক সর্বসাধারণ নিয়ম মেনে চললেই হল। পুরুষে-পুরুষেও যেন বেশী সম্পর্ক না থাকে। যোগশাস্ত্রে একে 'শৌচ' বলা হয়েছে। দুইটি কথা যোগশাস্ত্রে আছে: (১) যম—অহিংসা, সত্য ইত্যাদি এবং (২) শৌচ—পবিত্রতার ভাবনা। এর তাৎপর্য, নিজের শরীরের প্রতি ঘৃণার ভাব রাখা। 'স্বাংগ জুগুপ্সা!' এরকম নোংরা শরীর নিয়ে কি করে আমি অন্যের সংস্পর্শে যেতে পারি!—এতে এ বিচার আসে। এমন ক্লেদময় শরীর নিয়ে আমি অন্যের সংস্পর্শে বেশী আসব না। এভাবে নিজের শরীর সম্বন্ধে যে অমঙ্গল

ভাব আসে, তাতে এমন এক রক্ষণের কাজ হয় যাতে অনর্থক সম্পর্ক গড়ে উঠতে পারে না। এজন্যেই কেবল নারী-পুরুষের মধ্যে অনর্থক সীমা টানার কোন প্রয়োজন নেই। সীমা যা থাকবে, তা নারী-পুরুষ নির্বিশেষে সকলের জন্যই সমানভাবে থাকবে।

'দেবী' মনে করা ভুল

এখন একটি অন্য কথা বলছি, যার সঙ্গে সমাজশাস্ত্রের সম্বন্ধ রয়েছে। সমাজে আজকাল মার্জিত লোকদের মধ্যে অনেক কৃত্রিমতা এসে গেছে। তাই নারীদের বেশী সম্মান দেখানো, যাকে 'দাক্ষিণ্যভাব' বলা যায় তা চলছে। মেয়েদের 'দেবী' বলা হয়। এভাবে একদিকে যেমন রয়েছে ঘৃণা, তিরস্কার ও অপাত্রতার ভাব, অন্যদিকে তেমন রয়েছে অধিক ভাবনা। পুরুষ নিজেকে নারীদের সেবক বলে মনে করে। মধ্যযুগে য়ুরোপের সর্দারদের মধ্যে যে 'শিবল্‌রি'-র (বীরত্বের) কথা এসেছিল, তা এ থেকেই এসেছিল। ফলে বর্তমান সমাজে এসেছে 'এটিকেট্‌'-এর (শিষ্টাচারের) রীতি। কিন্তু আমি মনে করি, এ থেকে বিষয়-বাসনাই বাড়ছে। মেয়েদের জন্য যেমন অপাত্রতার ভাবনা ভুল, তেমনি উঁচু বা অধিক ভাবনা রাখাও ভুল। আত্মায় নারী-পুরুষের ভেদ নেই, এ ভেদ শরীরের—এভাব এলে বাসনার নিবৃত্তি সহজ হবে।

সেবকদের কর্তব্য

সেবকদের জন্য পাঁচটি ব্রতের কথা বলা হয়েছে। যেমন—অহিংসা, অপরিগ্রহ ইত্যাদি। এই ব্রতগুলি পালন করবার জন্য সমাজে কীভাবে জীবনযাপন করতে হবে, তা ভেবে দেখতে হবে। মানুষের বীর্যশক্তি উৎপাদনের জন্য, যাঁদের মধ্যে ব্রতগ্রহণের শক্তির রয়েছে তাঁরা ব্রহ্মচর্য পালন করবেন, এরকম প্রত্যাশা করা হয়। এতে মানুষের বাসনা যত উপরে উঠবে, তত নীচে তার পতন হবে। পরিশেষে বলা যায়, যিনি প্রতিভার কাজ, রচনাত্মক কাজ করেন, তাঁর মধ্যে স্থূল রচনার ইচ্ছা অর্থাৎ সন্তান-লাভের ইচ্ছা কম হয়ে থাকে। এজন্যই রচনাত্মক

কাজ পবিত্র কাজ। সৃষ্টি উত্তম জিনিসের হওয়া চাই। যিনি তা করবেন, তাঁকে ছোটো জিনিস ছেড়ে দিতে হবে। বুদ্ধির প্রতিভা জ্যোতির মতো। ব্রহ্মচর্য ভিতরের তেল, যার আধারে আলো জ্বলে। ব্রহ্মচর্যে বুদ্ধির প্রতিভা আরো প্রখর হবে। এজন্যই যিনি বুদ্ধির কাজ করবেন, বড়ো জিনিস ভাববেন, তাঁর পক্ষে সামান্য সন্তান-উপাদনের কাজে বীর্যশক্তির ব্যবহার করা ঠিক হবে না।

উত্তম রচনাত্মক কাজ

বুদ্ধ, শংকরাচার্য, যীশু এঁরা সব ব্রহ্মচারী ছিলেন। তাঁরা বুদ্ধির এমন কাজ পেয়েছিলেন, যা খুব উঁচু-স্তরের ছিল। তাঁদের সমাধান মিলত উঁচু শ্রেণীর রচনাত্মক কাজ থেকে। এজন্যই সৃষ্টির সর্বসাধারণ প্রক্রিয়া থেকে তাঁরা সহজে বেঁচে গিয়েছিলেন। কাজেই সেবকদের জন্য চাই কোন উত্তম রচনার কাজ, উত্তম সৃষ্টির কাজ। সুতরাং যাঁদের সমাজ পরিবর্তন করতে হবে, ক্রান্তির কাজ করতে হবে, স্বাভাবিকভাবেই তাঁদের ব্রহ্মচর্যও পালন করতে হবে। আমাদের সামনে ঠিক এরকমই এক ক্রান্তির কাজ এসেছে। নতুন মানুষ তৈরি করতে হবে। সমস্ত সমাজ বদলাতে হবে। উত্তম সাহিত্য সৃষ্টি করতে হবে। ব্যক্তি ও সমাজজীবনে ভিন্ন ভিন্ন গুণের বিকাশ করতে হবে। এত সব মহৎ কাজ যাঁদের সামনে পড়ে আছে, তাঁদের কি স্থূল রচনায় রসের সন্ধান করলে চলে!

ভেটীয়া (মেদিনীপুর)

২০. ১. ৫৫

গৃহস্থাশ্রম

যদি যথাযথভাবে চিন্তা করা হয়, তবে দেখা যাবে যে গৃহস্থাশ্রমও ব্রহ্মচর্যের জন্যই। শাস্ত্রজ্ঞদের নির্দেশ অনুসারে চললে, ব্যবহার ও আচরণ করলে গৃহস্থাশ্রমও ব্রহ্মচর্য সাধনের এক উপায় হয়ে যায়। জীবন খুবই বিচিত্র। যে গন্তব্য স্থানে পৌঁছে গেছে তার পক্ষে জীবন এক সরল রেখা, আর যে পৌঁছাতে পারেনি তার কাছে তা বাঁকা। তাকে বাঁকা রাস্তা দিয়ে চলতে হয়।

আমি চাই যে তরুণ ছেলে-মেয়েরা, বিশেষ করে মেয়েরা ব্রহ্মবিদ্যার জন্য এগিয়ে আসুক। ব্রহ্মবিদ্যায় নারী-পুরুষের ভেদ নেই। এ নারী আর পুরুষের ভেদ মিটিয়ে দেয়। তবু এ কাজের জন্য আমি বোনেদের আশায় বসে আছি। এর আগে আমি ভাইদের জন্য চেষ্টা করেছি। কিন্তু সমাজের উত্থানের জন্য এখন এমন বোনেদের প্রয়োজন যাঁদের জীবনই ব্রহ্ম-বিদ্যাময় হয়ে যাবে। আমার বিশ্বাস, এ যুগের জন্য এ কাজ অত্যন্ত জরুরী।

এদিকে ত আমি এ কথা বলছি, ওদিকে আবার বিয়েতেও আশীর্বাদ করছি। এ এক বিচিত্র অবস্থা বলে মনে হবে। কিন্তু আসলে এ বিচিত্র নয়। আমরা অনেক জন্মের প্রবাসী। আমাদের বিকাশের কাজ চলেছে। আমরা সবাই একই পথ দিয়ে যাচ্ছি। সর্বোদয়, ভূদান, গ্রামদানের পথ ত স্বীকার করাই হয়েছে, কিন্তু সেইসঙ্গে আত্মদর্শনের পথও আমরা স্বীকার করে নিয়েছি। এতে কেউ এক কদম আগে ত কেউ এক কদম পিছনে রয়েছে। রাস্তায় চলতে-চলতে এরকম হয়ই। সব এক সঙ্গে চলে, কিন্তু কেউ-না-কেউ আগে-পিছে থাকে। আগে-পিছে থাকলেও যাত্রীরা এক সঙ্গেই থাকে।

একটি প্রশ্ন

গতকাল একটি বোন বড়ো সুন্দর ও বিলক্ষণ এক প্রশ্ন করেছিলেন।

প্রশ্নটি হচ্ছে—'আমরা ভাগবতে শুনি যে শ্রীকৃষ্ণের সঙ্গ পেয়ে গোপিনীরা মুক্ত হয়েছেন। কিন্তু গান্ধীজী ও আপনার সঙ্গ যেসব মেয়েরা পেয়েছেন ও পাচ্ছেন, তাঁদের কেন সাংসারিক বাসনা যায় না?'

বাপু ছিলেন মহাত্মা, আমি এক সাধারণ সাধক। এর চেয়ে বেশী কিছু হতেও চাইনে। তবে এ কথা ঠিক যে, ব্রহ্মচর্যের অভিজ্ঞতা বাপু তাঁর নিজস্ব পথে অর্জন করেছেন আর আমি আমার পথে। ব্রহ্মচর্যের জন্যে শ্রদ্ধা দুজনেরই গভীর। সত্যকে তিনিও প্রধান স্থান দিয়েছিলেন, আমিও দিই। আমি বিশ্বাস করি যে, সত্যনিষ্ঠার যা কিছু অংশ আমাদের জীবনে স্থান পেয়েছে তার প্রভাব সঙ্গীদের উপর অবশ্যই পড়বে। কিন্তু ভগবান শ্রীকৃষ্ণ কোথায় আর আমরা কোথায়?

ভাগবতে গীত হয়েছে—'কৃষ্ণস্তু ভগবান্ স্বয়ম্'। কাজেই ভগবানের সঙ্গে অন্য কারো তুলনা করা উচিত নয়। নিজেদের মনে মনে হলেও এরকম তুলনা অনেকে করেন, কিন্তু আমি করিনা। ঈশা মসীহের সঙ্গে বাপুর তুলনা করা হয়েছে। এও আমি পছন্দ করিনা। ঈশা মসীহ তাঁর নিজের মহিমায় অদ্বিতীয়। কোটি-কোটি ভক্ত তাঁর নামে তরে গেছেন। ভারতে শ্রীকৃষ্ণের স্থানও এরকমই, শ্রীরামের নামও রয়েছে। ইদানীং গৌতম বুদ্ধের নামও শোনা যাচ্ছে। এই তিনটি নামই পরমেশ্বরের। সত্য, প্রেম ও করুণা রূপে প্রতিদিন আমরা তাঁদের স্মরণ করি। তাই এই তিনজনের কারো সঙ্গে কারোর তুলনা হতে পারে না। আমরা এঁদের ভগবৎ-রূপেই দেখি। শ্রীকৃষ্ণ পরমেশ্বরের সঙ্গে এক-রূপ হয়ে গেছেন। ভারতে শ্রীকৃষ্ণের নামে অসংখ্য লোকের উদ্ধার হয়েছে। শংকর, রামানুজ, মাধবাচার্য, বল্লভাচার্য, শ্রীচৈতন্য, জ্ঞানদেব, তুকারাম, নরসীং মেহতা, মীরাবাঈ—কত বলব? তাঁরা সব শ্রীকৃষ্ণের নামে লীন হয়ে গেছেন। কাজেই পরমেশ্বরের যে রূপ আমরা চিন্তা করি, তার সঙ্গে কোনও মানুষের তুলনা করা শোভনীয় নয়।

এ বিষয়ে ইসলামের বিচার খুব ভালো। মহাপুরুষদের নাম ভগবানের

নামের সঙ্গে জুড়ে দেওয়ার প্রচলন হিন্দু ও খ্রীষ্টানদের মধ্যে রয়েছে। এতেও মাধুর্য আছে। **'যত্র যোগেশ্বরঃ কৃষ্ণো যত্র পার্থো ধনুর্ধরঃ'** এ গীতায় বলা হয়েছে। ধনুর্ধর পার্থের কী প্রয়োজন ছিল? শ্রীকৃষ্ণ একাই ত যথেষ্ট ছিলেন। তবুও শ্রীকৃষ্ণের সঙ্গে অর্জুনের নাম জুড়ে দেওয়া হয়েছে। ভক্তকে প্রাধান্য দেওয়া হয়েছে। যেখানে ভক্ত আর ভগবান উভয়ে উপস্থিত থাকেন সেখানেই বিজয় হয়, এরকম বলা হয়েছে। কিন্তু ইসলামে খুব স্পষ্ট করে বলা হয়েছে যে, আল্লার সঙ্গে কারো নাম জুড়ে দেয়া উচিত নয়। আল্লা ছাড়া অন্য কেউ পূজনীয় হতে পারে না। 'লা ইলাহ ইল্‌-লল্‌ লাহ। মহম্মদ ইয়া রস্থল উল্লাহ।' মহম্মদ পয়গম্বর মাত্র, খোদার সন্দেশবাহী সেবক মাত্র। তিনি আল্লার স্থান নিতে পারেন না।

হুটুণ্ডি.
২৬, ২, ৫১,

বিয়ের প্রশ্ন*

বিয়ের ব্যাপারে মা-বাবা পরামর্শ দিতে পারেন, সাহায্য করতে পারেন। কিন্তু এ ব্যাপারে মেয়ের সিদ্ধান্তকেই মেনে নেওয়া উচিত। মা-বাবার পরামর্শ যদি মেয়ের ভালো মনে হয়, তবে ত কোন কথাই নেই। কিন্তু যদি ভালো মনে না হয়, তাতেও মা-বাবার দুঃখিত হওয়া উচিত নয়। তবু যদি তাঁদের দুঃখ হয়ই তাহলে সেখানে মেয়ের কোন দোষ আছে বলে মেনে নিতে আমি প্রস্তুত এই। যা হৃদয় স্বীকার করে না মা-বাবার সন্তুষ্টির জন্য মেনে নেওয়া কখনো উচিত নয়। কারণ, যে কথাকে হৃদয় ভালো বলে গ্রহণ করে না, তাকে মেনে নেওয়ার অর্থ নিজের হৃদয়কে ধোঁকা দেওয়া। আব ফলও হৃদয়কে ধোঁকা দেওয়ার মতোই হবে।

তোমার মনে যার জন্য বিশেষ অনুরাগ জন্মেছে, কিন্তু তুমি ভালোভাবেই

* একটী মেয়েকে লেখা চিঠি থেকে।

জান যে সে তোমাকে চায় না, তার সঙ্গে বিয়ে করার কল্পনা তোমার ছেড়ে দেওয়াই উচিত। সকলের জন্য সদ্‌ভাবনা রাখা যেমন বাঞ্ছনীয়, তার জন্যও তেমন রাখবে। কিন্তু এমন নিরপেক্ষ ভাব রাখা যদি তোমার পক্ষে অসম্ভব হয় আর তীব্র প্রেম অনুভব কর এবং এতেও তার দিক থেকে কোন অনুকূলতা না আসে, তাহলে শারীরিক বিয়েব চিন্তা ছেড়ে দিয়ে তাকে পরমাত্মার প্রতীক রূপে বরণ করে নিতে হবে এবং ব্রহ্মচারিণী হয়ে জীবন অতিবাহিত করতে হবে। এসব তোমার পক্ষে কতদূর গ্রহণীয় হবে, তা জানিনা। আত্মপরীক্ষার পর স্বয়ং তোমাকেই তা স্থির করে নিতে হবে। আমার উত্তর স্বয়ং পূর্ণ। প্রত্যেকে নিজ-নিজ অবস্থা বিবেচনা করে এর প্রয়োগ নিজের উপর করতে পারে।

আরও কিছু প্রয়োজনীয় কথা জানাতে চাই। নিজের মনঃস্থিতির প্রকৃত জ্ঞান অনেক সময় মানুষের হয় না। বস্তুর যথার্থ দর্শন একেবারে কাছে থেকেও হয় না আবার অনেক দূর থেকেও হয় না। অল্প দূর থেকে তার দর্শন হয়। যা কাছে থেকে অনেক চিন্তা-ভাবনা করেও ধ্যানে আসে না, তাই আবার কিছুক্ষণ পরে অমনি এসে যায়। কাজেই মানসিক ব্যাকুলতা ত ছেড়ে দেওয়া চাই ই।

মাকে আমরা সহজভাবে পাই। তাঁকে বেছে আনতে হয় না। সেই রকম ঈশ্বরের পরিকল্পনায় স্বামীও স্বাভাবিক নিয়মে লাভ হয়। এ বিশ্বাস যদি থাকে, তবে চাঞ্চল্য কম হবে। কারণ পরমেশ্বর কোন শারীরিক বস্তু নন, তিনি মানসিক বস্তু। সারা বিশ্বকে পরিপূর্ণ প্রেম দিয়ে দেখতে শেখার জন্যই লগ্ন (বিয়ে) প্রভৃতির ব্যবস্থা। হৃদয়ের বিরুদ্ধে কোনো কাজ করা উচিত নয়। ধৈর্য সহকারে কাজ শুরু কর এবং ঈশ্বরের উপর বিশ্বাস রাখ। যখনই কিছু জিজ্ঞেস করার থাকবে, স্বচ্ছন্দে জিজ্ঞেস করবে।

তোমার ব্যক্তিগত পরিচয় আমার জানা নেই। তার প্রয়োজনও নেই। কারণ এই শরীরকে ত ভুলে যেতেই হবে।

মারাঠী হরিজন,
২০, ১০, ৪৬

যথার্থ পাতিব্রত্য ধর্ম

প্রশ্ন : আপনি বোনেদের চুড়ি, গয়না প্রভৃতি না পরার জন্য বলেছেন। এতে কি পাতিব্রত্যের চিহ্নের উপর আঘাত করা হয়নি ?

বিনোবা : পাতিব্রত্য কি তা আপনাদের ভেবে দেখা উচিত। পাতিব্রত্য কি একাংগী বস্তু ? পুরুষেরও কি পত্নীব্রত হওয়া উচিত নয় ? আপনাদের মধ্যে অনেকেই হয়ত পতি। পত্নীব্রতের কোন চিহ্ন আমাকে দেখান ত ? কিছু আছে বলে ত আমি দেখিনা। পত্নীব্রত দেখাবার জন্য যদি কোন চিহ্নের প্রয়োজন না হয়, তবে পাতিব্রত্যের জন্যই বা কেন দরকার হবে ? এতে পাতিব্রত্যের প্রশ্ন নেই। প্রশ্ন এই—নারী কি পুরুষের দাসী ? তাকে দাসী বলে মনে করা একেবারে ভুল। আমরা এর বিরোধিতা করব। নারী এক স্বতন্ত্র, এক পৃথক জীব। জীবাত্মা পুরুষের মধ্যে যেমন নারীর মধ্যেও তেমনই বলবান। একথা বোঝা দরকার যে, পরমেশ্বরের সঙ্গে স্ত্রীরও সরাসরি সম্পর্ক রয়েছে। আপনারা কি মনে করেন যে ভগবানের সঙ্গে স্ত্রীর সম্বন্ধ 'স্বামীর এজেন্সী'র মাধ্যমে হয়ে থাকে ? স্ত্রীর যদি সে রকম এজেন্সীর প্রয়োজন হয়, তাহলে স্বামীরও ঈশ্বরের সঙ্গে সম্বন্ধ স্থাপন করার জন্য স্ত্রীর এজেন্সী দরকার হবে।

মেয়েদের নাক-কান ফুটো করে দেওয়া হয়। গয়না পরাবার জন্য এসব করা হয়। এ সবই ঈশ্বরের বিরুদ্ধে অনাস্থাজ্ঞাপক ব্যাপার। ঈশ্বর যদি চাইতেন, তাহলে তিনিই কি নাক-কান ফুটো করে দিতে পারতেন না ? ঈশ্বর মুক্তাতেও ত কোন ফুটো রাখেননি। কিন্তু আমরা সমুদ্র থেকে মুক্তা তুলে এনে তা ফুটো করে মেয়েদের নাকে কানে লাগিয়ে দিই। তাদের নাক, কান, গলা, হাত-পা প্রভৃতিতে সোনা-মুক্তার গয়না পরাই। কি ব্যাপার! পুরো কোলারের সোনার খনিটাকেই কি এদের গায়ের উপর চাপিয়ে দিতে হবে ? মেয়েদের উপর এতসব বোঝা চাপিয়ে দিয়ে আবার আমরাই তাদের 'ভীরু' বলি। 'ভীরু' বলা যেন মেয়েদের প্রশংসা করা! আমরা মনে করি, পুরুষদের

আশ্রয়েই মেয়েদেব সুরক্ষিত থাকা উচিত। এ কোন ধর্মসম্মত বিচার হতে পারে না। ধর্ম বলে যে প্রত্যেকের মধ্যে আত্মা বিরাজমান। পরমেশ্বরের বর্ণনা করতে গিয়ে উপনিষদে বলা হয়েছে—'তুমিই স্ত্রী, তুমিই পুরুষ'।

কিছু লোক মনে করে যে, পুরুষ পুরুষত্বের আর নারী প্রকৃতির প্রতিনিধি। সাংখ্য বলে যে, পুরুষ-প্রকৃতি এ দুই তত্ত্ব। অর্থাৎ মহেশ্বর ও মায়া। তাতে পুরুষ মহেশ্বরের প্রতিনিধি, নারী প্রকৃতির। প্রকৃতি জড় বস্তু। অর্থাৎ নারী জড় বস্তুর প্রতিনিধি আর পুরুষ চৈতন্যের। এ অত্যন্ত ভ্রান্ত বিচার। আত্মতত্ত্ব পুরুষের মধ্যে যেমন নারীর মধ্যেও তেমনই রয়েছে আর প্রকৃতির জড় অংশ পুরুষে যেমন নারীতেও তেমন আছে। কিন্তু ভারতের তত্ত্বজ্ঞানে এ এক মস্তবড়ো ভুল হয়েছে। পার্বতী ও পরমেশ্বর বলতে মনে করা হয় পরমেশ্বর হচ্ছে পুরুষ আর পার্বতী স্ত্রী। এভাবে তত্ত্বজ্ঞানে এক ভুল বিচার এসে গেছে। পরমেশ্বরের প্রতিনিধি যদি পুরুষ হয়, তবে নারীও তাঁর প্রতিনিধি। পার্বতীর অংশ যেমন পুরুষের মধ্যে আছে, তেমন নারীর মধ্যেও আছে। শরীর হচ্ছে পার্বতী, যা নারী-পুরুষ দুয়েরই আছে ; আর নারী-পুরুষ দুয়ের অন্তরে যে জ্ঞান আছে তাই পরমেশ্বর। কিন্তু আমাদের দেশে ভ্রান্তধারণা বশত তত্ত্বজ্ঞানে নারীর স্থান গৌণ বলে ধরা হয়েছে। আমরা এ ধারণার আমূল পরিবর্তন করতে চাই। এতে যদি পাতিব্রত্যের উপরও আঘাত এসে যায়, তাহলে আমরা নিরুপায়।

পাতিব্রত্যের অর্থ এই দাঁড়িয়ে গেছে যে স্বামী উত্তম বা অধম প্রকৃতির যাই হোক-না কেন স্ত্রীকে তার সঙ্গে লীন হয়ে যেতেই হবে। স্ত্রীর স্বতন্ত্র কোন অস্তিত্ব নেই। কিন্তু পতিব্রতার অর্থ ত স্বামীর ব্রতে যোগ দেওয়া। স্বামী যদি মদ্যপায়ী হয়, তাহলে তার মদ্যপানে সহায়তা না করে বরং তার হাত ধরতে হবে এবং মদের পেয়ালা ছুড়ে ফেলে দিতে হবে। তাকে বলতে হবে 'তুমি যদি মদ না ছাড়, তবে আমি তোমাকে খেতে দেব না।' এতে যদি স্বামী বলে, 'তোকে আমি মারব', তাহলে বলা চাই—'মার তাতে তোমারই হাত ব্যথা হবে, কিন্তু

আমি তোমার রান্না করব না।' এই হল পাতিব্রত্য ধর্ম। আমি ত মনে করি পুরুষের উপর শাসন রাখা, অংকুশ রাখাই নারীর ধর্ম। নারী যেন পুরুষের সমান হতে চেষ্টা না করেন, বরং তার উপর অংকুশ রাখেন। বর্তমানে মেয়েদের স্থান খুবই গৌণ। কিছুলোক বলেন, স্ত্রীকে স্বামীর সমান অধিকার দেওয়া উচিত। তা ত অবশ্যই দেওয়া উচিত। কিন্তু এ-ই যথেষ্ট নয়। মেয়েদের পরিপূর্ণ আধ্যাত্মিক অধিকার থাকা চাই। মেয়েদের বেদাধ্যয়ন, ব্রহ্মচর্য, সন্ন্যাস ইত্যাদিতে অধিকার নাই। এ ধরনের আধ্যাত্মিক অপাত্রতা তাদের উপর চাপিয়ে দেওয়া হয়েছে। এ সহ্য করে নেওয়ার মতো জিনিস নয়। তাই আমরা এর উপর আক্রমণ করছি। অবশেষে, যেসব গয়নাদি মেয়েদের পরানো হয় তা কোলারের সোনার খনিতে ফেলে দাও। এই সোনা দুনিয়ার কোন কল্যাণ করেনি। বলা হয়ে থাকে যে, সোনা আর মাটির যোগ্যতা সমান। বিচার করলে দেখা যাবে যে, এ ঠিক কথা নয়। মাটির যোগ্যতা ঢের বেশী।

মহীশূর,
১৮. ১০. ৫৭.

পতিব্রতার অর্থ

লোকে বলে যে, স্ত্রীর ধর্ম স্বামীকে অনুসরণ করা। 'জ্ঞানেশ্বরী'তে একটি কথা আছে: 'পিতিচিয়াং মতা অনুসরোনী পতিব্রতা'—স্বামীর মতানুসারে চলাতেই পতিব্রতা স্ত্রীর কল্যাণ। তা পড়ে ত আমি ভাবতেই লাগলাম—জ্ঞানেশ্বরের এ কী দৃষ্টিভঙ্গী? কিন্তু পরে যখন রাজওয়াড়ে প্রণীত 'জ্ঞানেশ্বরী'র সংশোধিত সংস্করণ আমার কাছে এল, তাতে পুরানো পাঠভেদেরও উল্লেখ ছিল, তখন আমি পড়লাম: 'পতিচিয়াং ব্রতা অনুসরোনী পতিব্রতা'—স্বামীর ব্রতপালনে যে স্ত্রী সাহায্য করে সে পতিব্রতা। জ্ঞানদেব এ নিশ্চয়ই লেখেননি সে স্বামীর মত যে স্ত্রী অনুসরণ করে সে পতিব্রতা। কিন্তু জ্ঞানদেবের এ কথা সমাজের হয়ত ভাল লাগেনি। তাই 'ব্রতা'র বদলে 'মতা' করে দেওয়া

হয়েছে। এর থেকে অনুমান করা যায় যে, সাহিত্যের উপর কতখানি অত্যাচার করা হয়েছে। এসব কাহিনী একদিকে যেমন খুবই হৃদয়বিদারক, অন্যদিকে তেমনই কৌতুকপ্রদ।

পণ্ঢরপুর,

৩১, ৫, ৫৮,

কূয়ো ও বিয়ে

[আজ একটি গ্রামে বিয়ে ছিল। প্রতি বছর সে অঞ্চলে প্রায় কুড়ি পঁচিশটি বিয়ে হয়। বিনোবা গণিতের ভাষায় কিছু বললেন।]

ছত্রিশ কোটি লোক। আয়ু গড়ে চল্লিশ-পঞ্চাশ বছর। চল্লিশ-পঞ্চাশ বছরে আঠার কোটি বিয়ে হবে। যদি এরকম নিয়ম থাকে যে প্রত্যেক বিয়েতে একটি করে কূয়ো খুঁড়তে হবে, তবে চল্লিশ পঞ্চাশ বছরে আঠার কোটি কূয়ো হয়ে যাবে। ভগীরথ স্বর্গ থেকে গঙ্গা এনেছিলেন। আপনারা পাতাল থেকে সরস্বতী আনুন, কূয়ো কাটাকে খাদির এক অঙ্গ বলে মনে করুন। যে-পর্যন্ত কূয়ো কাটার জন্য প্রস্তুত হতে না পারছেন, প্রয়োজনীয় টাকা না জমাতে পারছেন ততদিন না হয় খাদির কাজ না-ই করবেন।

[পরে একটু রসিকতা করে বললেন:]

আর কূয়ো হয়ে যাওয়ার পর মহারাজ যদি চাষ না করেন, তবে সে তাঁর দুর্ভাগ্য এবং তিনি নিরাশ হলে ঐ কূয়োতেই ডুবে মরতে পারবেন।

তুরপল্লী,

২৬, ৪, ৫১,

নারী ও পুরুষের সহযোগিতা

প্রাচীনকাল থেকে এ প্রথা ভারতবর্ষে চলে এসেছে যে, প্রত্যেক শুভ কাজে নারীদের সহযোগিতা থাকা আবশ্যক এবং তবেই সেকাজকে পূর্ণ বলে স্বীকার করা যাবে। হিন্দুধর্ম বলে, স্ত্রী ব্যতীত যজ্ঞ হয় না। সীতাদেবী যখন নির্বাসনে

তখন রামচন্দ্রের যজ্ঞ করতে হয়েছিল। ত বিশ্বামিত্র বললেন, স্ত্রীর অনুপস্থিতিতে যজ্ঞ হতে পারে না। অবশেষে সীতাদেবীর মৃণ্ময়ী প্রতিমা তৈরি করে নেওয়া হল। এর অর্থ হচ্ছে, কোন গৃহস্থপুরুষ স্ত্রীকে বাদ দিয়ে সার্বজনিক কাজ করতে পারে না। স্ত্রীকে সহধর্মিণী বলা হয়েছে। সহধর্ম অর্থাৎ পুরুষ যে ধর্ম করে তাতে স্ত্রীরও সহযোগিতা থাকবে, এই কথা বলা হয়েছে। কিন্তু মাঝখানে শত-শত বছর ধরে মুসলমান রাজত্ব চলেছে। তারপর ইংরেজ শাসনের আমলে শহরবাসীদের যাদের চাকরি করার ইচ্ছা ছিল, অর্থ উপার্জন করতে হয়েছিল তারা বুট-প্যাণ্ট পরে ইংরেজদের অনুকরণ করতে লাগল। ঠিক এভাবেই মুসলমান আমলেও 'জী-হাঁ' বলে শহরবাসীরা কৃপাপ্রার্থীরূপে পাশে স্থান পাওয়ার জন্য মুসলমানদের চালচলন অনুকরণ করত। পর্দাপ্রথাও মুসলমানদের কাছ থেকেই নেওয়া হয়েছে। তখন থেকেই এই গোলামি আমাদের সমাজে এসেছে। নারীকে পর্দার আড়ালে রাখাকে কৌলীন্য বলে মনে করা হল। একে নিজেদের এক ধর্ম বলে মনে করা হল। আর এভাবে ধর্মের নাম দিয়ে লোকেরা বোনেদের ঘরে বন্ধ করে রাখতে আরম্ভ করল।

জ্ঞান ছাড়া মুক্তি নেই

জ্ঞানের কথা শোনার প্রয়োজন যদি বোনেদের না থাকত তাহলে ভগবান তাঁদের কানই দিতেন না। কিন্তু কান ত পুরুষের মতো নারীরও আছে। এর থেকে একথা স্পষ্ট হয়ে যায় যে নারীদেরও জ্ঞানের কথা শোনার সুযোগ থাকা দরকার। জ্ঞান ছাড়া মুক্তি পাওয়া যায় না। "জ্ঞানং বিনা মুক্তির্ন ভবতি জন্মশতেন।" কাজেই নারীদেরও জ্ঞানলাভের সুযোগ পাওয়া চাই। হাঁ, ঘরে তাঁরা রান্নাবান্না প্রভৃতি নানা কাজ নিয়ে ব্যস্ত থাকেন বটে, কিন্তু সার্বজনিক কোন কিছুতেই তাঁদের বুদ্ধি ব্যবহৃত হয় না। সমাজকে এগিয়ে যেতে হবে। এরজন্যই নারী ও পুরুষের মধ্যে যে ভেদ রয়েছে তা দূর করে দেওয়া চাই।

জমুয়াওয়া (শাহাবাদ),

২৬ ৫. ৫৪

ধর্মসংকট ও স্বামী-স্ত্রী

প্রশ্ন : আপনার কি এরকম মনে হয় না যে, রামচন্দ্র সীতাকে ত্যাগ করে অন্যায় করেছিলেন ?

বিনোবা : এটি তর্কমূলক বিষয়। মানুষের সামনে কখনও কখনও ধর্মসংকট অর্থাৎ দুটি ধর্ম একই সময়ে উপস্থিত হয়। তখন কোনটিকে প্রধান আর কোনটিকে গৌণ বলে ধরতে হবে তা এক সমস্যা হয়ে দাঁড়ায়।

মহারাষ্ট্রের প্রজাসমাজবাদী দলের সামনে এক ধর্মসংকট উপস্থিত হয়েছিল। এক ধর্ম বলছিল কম্যুনিষ্টদের কাছ থেকে দূরে থাকতে হবে এবং অপর ধর্ম বলছিল কম্যুনিষ্টদের সঙ্গে মিলেমিশে কাজ করতে হবে। এ দুটি ধর্মের একটিকে তাঁরা বেছে নিয়েছিলেন। তাঁদের ভুল হয়েছিল না ঠিক হয়েছিল তা ভবিষ্যতই বলতে পারে। সেরকম রামচন্দ্রের সামনেও দুটি ধর্ম ছিল—এক রাজধর্ম, দুই পতিধর্ম। এর মধ্য থেকে তাঁকে যেকোন একটিকে বেছে নিয়ে অন্যটিকে ছেড়ে দিতে হয়েছিল। হয় রাজ্যকে ছেড়ে দিয়ে স্ত্রীকে, নয় স্ত্রীকে ছেড়ে দিয়ে রাজ্যকে বেছে নিতে হল। কিন্তু বিপদ ছিল দুদিক থেকেই। রাম যা কিছু করতেন তাতেই পাপ হত। এ অবস্থায় রাম দেখলেন যে সীতা কিছুতেই রামকে ভুল বুঝতে পারেন না। সীতা সম্বন্ধে রামের এ বিশ্বাস ছিল। কিন্তু প্রজাদের সম্পর্কে রামের এ বিশ্বাস ছিল না। এজন্যই রাম সীতাকেই আশ্রমের কাছাকাছি কোন বনে রেখে আসার জন্য লক্ষ্মণকে নির্দেশ দিয়েছিলেন। রামের এই দৃঢ় বিশ্বাস ছিল যে সারা বিশ্বও যদি তাঁকে নিষ্ঠুর বলে অপবাদ দেয়, তবু সীতা কখনো তা দেবেন না। এখন আপনারা যদি রামের উপর দোষারোপ করতে চান ত করুন, কিন্তু সীতা কখনো তা করেননি।

ছোটো আরম্ভের বড়ো ফল

কস্তুরবা গান্ধীজীর স্ত্রী ছিলেন। গান্ধীজী যেমন লেখা-পড়া জানা

ছিলেন কস্তুরবা তেমন ছিলেন না, কিন্তু তাঁর ভাগ্য বড়ো ছিল। বশিষ্ঠ ও অরুন্ধতীর মতো গান্ধীজী ও কস্তুরবার নাম আজ সার্বভৌম হয়ে গেছে। বিবাহবিধিতে বর-কনেকে উত্তরমুখী হয়ে দাঁড়াতে হয় এবং অরুন্ধতীর দিকে দৃষ্টি রাখতে বলা হয়। উত্তর দিকে বশিষ্ঠনক্ষত্রের পাশেই অরুন্ধতী নামে ছোটো আর একটি নক্ষত্র আছে। এ দুটি নক্ষত্র দর্শন করে তাদের উদ্দেশ্যে প্রণাম জানাবার বিধি আজও বিবাহ অনুষ্ঠানে প্রচলিত রয়েছে। এভাবে বশিষ্ঠের সঙ্গে অরুন্ধতীর নাম অমর হয়ে আছে। দেহের পাশে ছায়া থাকে, কিন্তু মানুষ ছায়ার দিকে নজর দেয় না। এ সত্ত্বেও ছায়া মানুষকে ছাড়ে না। অরুন্ধতীর অবস্থা এমনিই ছিল। তাঁর ইচ্ছা ছিল সুখে-দুঃখে স্বামীর সঙ্গে থাকা। স্বামী সংকটে পড়েন ত তাঁরও সংকটকে বরণ করে নেওয়া, স্বামী স্বর্গে যান ত সেইসঙ্গে তাঁরও স্বর্গে যাওয়া এবং কোথাও না থেমে চলা—এই ব্রতের জন্যই তাঁর নাম হয়েছিল 'অরুন্ধতী'। ঠিক তেমনই আর একটি নাম 'সীতা'। আমরা 'রাজা রাম'-এর সঙ্গে 'সীতা রাম'-ও বলি। রাম বনবাসে চললেন ত সীতাও তাঁর সঙ্গ নিলেন। এতে রাম বললেন, 'মা ত তোমাকে বনে যেতে বলেননি।' উত্তরে সীতা বললেন, 'তুমি সুখ ভোগের জন্য যদি কোথাও যেতে তাহলে না হয় এক কথা ছিল। কিন্তু তুমি যাচ্ছ বনে, কাজেই তোমাকে ছেড়ে আমি থাকব না।'

ভালো ঘর কাকে বলে ?

মা-বাবা কামনা করেন যে মেয়ে ভালো ঘরে যাক। ভালো ঘরের লক্ষণ কি ?—যে ঘরে গেলে জল টানতে হবে না। যেখানে জল পর্যন্ত টানতে হয় না, সেখানে ত যা খাওয়া হয় তা হজমই হয় না আর কেবল ডাক্তারের বিল শোধ করতে হয়।

পার্বতী বলেছিলেন, 'আমি শংকরকেই বরণ করব।' বড়ো বড়ো ঋষি-

মহর্ষিরা বললেন, 'শংকর ত ভিখারী। তাঁর কাছে গিয়ে কি করবে? কোন ভালো ঘরে যাও।' কিন্তু পার্বতী বললেন, 'আমাকে তাঁর কাছেই যেতে হবে।'

রামায়ণেও একটি সুন্দর কাহিনী আছে। শোনার মতো। রামচন্দ্রের বনবাসের কথা শুনে সীতা বললেন 'আমি যাব।' তেমন জীবনে ত অভ্যস্ত ছিলেন না, তবু স্থির করেছিলেন যেখানে রামচন্দ্র যাবেন সেখানে তিনিও যাবেন। কিন্তু কৌশল্যা শুনে বললেন, 'রাম যাবে আর সীতাও যাবে। সীতার কী দশা হবে? আমি ত ওকে কোনদিন বাতি পর্যন্ত জ্বালাতে দিইনি।' অর্থাৎ সেখানেও শ্রমের মর্যাদাকে স্বীকার করা হয়নি। অন্য ঘরের মেয়ে হলেও ছেলের বৌকে নিজের মেয়ের মতো দেখা ত ভালোই। কিন্তু এতে যে শরীরশ্রমকে হীন বলে ধরা হয়েছে তা স্পষ্ট।

জামালপুর
২২. ১০. ৫৩

গৃহস্থালির দুই চাকা

লোকেদের মধ্যে সাধারণত দেখা যায় যে পুরুষেরাই সমবেতভাবে ঈশ্বরের নামকীর্তন করে। কিন্তু নারীদের জন্য কি কোন ভগবানই নেই? গ্রামের সকল মা বোনেদেরও এক স্থানে সমবেত হয়ে প্রেমের সঙ্গে কিছুক্ষণের জন্য ভগবানের নামকীর্তন করা উচিত। গৃহস্থালির দুই চাকা- তার একটি নারী, অপরটি পুরুষ। পুরুষদের যেমন ধর্ম আছে তেমন নারীদেরও ধর্ম আছে। পুরুষের মতো নারীরও আত্মা আছে। ভগবানের কাছে নারী ও পুরুষ সমান।

সর্বোদয়,
এপ্রিল ৫১

বিয়ের সঙ্গে পয়সার কী সম্বন্ধ

ধর্ম ছাড়া সমাজ বাঁচতে পারে না। ঘরে ধন-সম্পদ রাখা হয় তাতে শান্তি

নেই, তা আবার বুকে লাগিয়ে রাখতে হবে! ফলে বোনেরা ভীরু হয়। গয়নাগুলি বেড়ি ছাড়া আর কি? কিন্তু তা বুঝতে পারে না। সোনা যে! স্ত্রীকে যদি দু-দু সের সোনার বেড়ি দেওয়া হয় তবে তিনি 'খুশী' হয়ে যান। গয়না যে! কিন্তু যদি লোহার হয় তখন তা বেড়ি হয়ে যাবে। গয়না পড়লে বোনেরা ভীরু হয়ে যায়। তাছাড়া এ বোনেদের গোলাম বানিয়েছে। আমি দেখছি, তাঁরা যখন বাড়ীর বাইরে যান, তখন পালকির মধ্যে ঢুকে দরজা বন্ধ করে তাতে যান। কেন? সূর্যের আলো কি তাঁদের কিছু ক্ষতি করবে? আমি বলি, পালকিতে কেন ট্রাংকে পাঠালে ত আরো নিরাপদ। এত লোভ, এত আসক্তি! আবার বলবে যে বিয়ে দেওয়া যাচ্ছে না। কেন, ছেলে নেই না মেয়ে নেই? ছেলে মেয়েকে চায় এবং মেয়ে ছেলেকে চায় ত মুশকিল কোথায়? তিলক পরাতে হবে। পয়সা ছাড়া কোন কথাই নেই। এমনও হয় যে ছেলে মেয়েকে পছন্দ করেছে মেয়ে ছেলেকে পছন্দ করেছে সেখানে আর কী আপত্তি থাকে? কিন্তু বলবে—'আমার ছেলে এম. এ.। পাঁচ হাজার টাকায় হবে না।' এক ভাই আমাকে চিঠি লিখেছিলেন। তাঁর নামের সঙ্গে প্রায় দশ-পনরটি অক্ষর লাগানো ছিল। অক্ষরগুলিকে ইঞ্জিনের মতো মনে হচ্ছিল। এতগুলি ইঞ্জিন ছাড়া যিনি নড়েন না তিনি ত জড় পুতুল হয়ে গেছেন। তিনি বিলেতে গিয়ে ডিগ্রী নিয়ে এসেছিলেন। আপনারা কি বলেন, পাঁচ হাজারে বিয়ে হবে না? দর আরো বাড়বে? এ ত বেচা-কেনার ব্যাপার। এ কি কোন ধর্মকার্য? শাস্ত্রের সাহায্য নেওয়া হয়, বেদ ভগবানের মন্ত্রগুলিকে কষ্ট দেওয়া হয়, আবার বাজারের মতো দর কষাকষি চলে! কী অধর্ম? এত অধর্ম করছে আবার বলছে—আমি দুঃখী। যেখানে অধর্ম হবে সেখানে ভগবান ত দুঃখই দেবেন।

পথনাহা (চম্পারণ)

১৬. ৬. ৫৪

জন্ম-নিয়ন্ত্রণ

আমাকে প্রশ্ন করা হয়েছে, 'পরিবার-পরিকল্পনা নিয়ে সরকার কতই না আগ্রহ প্রকাশ করছে। এ সম্বন্ধে আপনার মত কি?' আমার স্বীকার করতে বাধা নেই যে এসব যা চলছে তা আমি বুঝতে পারি না। প্রতি বর্গমাইলে জাপানে যেখানে লোকসংখ্যা এক হাজার, সেখানে ভারতে তিন শ'। তবু ভারতে লোকসংখ্যা বেশী এ কথা কেন বলা হয়? এ কি কিছু পুরুষার্থের কথা? লোকসংখ্যার আধিক্য হেতু ভারতে জীবিকার্জনের কোন ব্যবস্থা হতে পারছে না, এই ত প্রশ্ন। আসলে এ সামাজিক ও আধ্যাত্মিক ব্যাপার। কিন্তু আজকাল এক হাওয়া উঠেছে কৃত্রিম উপায়ে জন্মনিয়ন্ত্রণ করার এবং বিষয়-বাসনা অবাধে বাড়াবার।

শিক্ষা ও নৈতিকতা

এসব আবার জীবে দয়ার নামে চলেছে এবং বড়ো বড়ো পরোপকারীরা এতে রয়েছেন। তাঁরা ভাবেন, এ না হলে বোনেদের মুক্ত করা যাবে না। কিন্তু আমি মনে করি, বোনেদের মধ্যেই এ শক্তি কেন থাকবে না যাতে তাঁরা নিজেরাই নিজেদের রক্ষা করতে পারেন। স্ত্রীকে সর্বদা স্বামীর বশে থাকতে হবে এই যে এক বদ্ধ ধারণা চলে আসছে তা অত্যন্ত ভুল। এ বিষয়ে বোনেদের জন্য উত্তম শিক্ষার ব্যবস্থা রাখতে হবে যাতে তাঁদের নৈতিকতা বৃদ্ধি পায়। ক্ষেতে সামান্য বীজ বোনা নিয়ে লোকেরা কত চিন্তা করে। ধরুন কোন চাষীভাই যদি মৃগনক্ষত্রের পরিবর্তে যখন মাঠ রোদে পুড়ে যাচ্ছে সেই মে মাসে বীজ বোনে, তাহ'লে তাকে কী বলা যাবে? আর সেই ভাই তখন যদি বলে যে, এ তার বীজ অংকুরিত না হওয়ার প্লানিং, তবে আপনারা বলবেন, এ ন্যাশনাল ওয়েস্টেজ (জাতীয় অপব্যয়)। এভাবে মানুষ বীজের প্রয়োগ করবে অথচ তার কোন ফল হবে না—এ এক অর্থহীন কল্পনা। যে কোন বৈজ্ঞানিক বলবেন ক্রিয়া নিস্ফল হওয়া উচিত নয়। কিন্তু আজকালকার

বৈজ্ঞানিকরা এত দীন হয়ে গেছেন যে, তাঁরা চিন্তাই করেন না। মানুষ যখন বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিসম্পন্ন হবে তখন কোনও ক্রিয়াকে নিষ্ফল করার কথা ভাববেই না। ক্রিয়ার সঙ্গেই পৌরুষের সম্পর্ক। কাজেই এসব কাজ যা হচ্ছে তা আমার বোধশক্তির বাইরে।

পুরুষার্থ ও সংযমই উপায়

আসলে এভাবে ভারতের জনসাধারণের মধ্যে পরিবার-পরিকল্পনার বিচার বিস্তার লাভ করবে না। কারণ এ সম্বন্ধে অনেক কিছু ভাববার রয়েছে। পুরুষার্থ বাড়লে বিষয়-বাসনাও কমে যায়—এ অভিজ্ঞতার কথা। প্রত্যেকেই যদি পুরুষার্থের সুযোগ পায়, তবে স্বাভাবিকভাবেই বিষয়-বাসনার উপরও নিয়ন্ত্রণ এসে যাবে। আর সেইসঙ্গে ভারতে জীবিকার্জনের ব্যবস্থাদিও বেড়ে যাবে। যেখানে খাওয়ার ও পুষ্টির অভাব সেখানে ভোগ-বাসনা বাড়বেই। পশুদের মধ্যেও এ জিনিস দেখা গেছে। বলিষ্ঠ পশু অপেক্ষা দুর্বল পশুর মধ্যে কাম-বাসনা বেশী। উপরন্তু দুর্বলের সন্তানও নির্বীর্য ও পঙ্গু হয়ে থাকে। এজন্যই একে আমি সামাজিক ও আধ্যাত্মিক বিষয় বলি। এ কোন তামাসার বিষয়বস্তু নয়। সংযমের অনুকূল পরিবেশ সৃষ্টি করা চাই। এরজন্য সমাজে একদিকে পুরুষার্থ বাড়াতে হবে, সাহিত্যের সংস্কার করতে হবে; অন্যদিকে নোংরা সাহিত্য, অশ্লীল সিনেমা প্রভৃতি বন্ধ করতে হবে।

গেদপাড়ু (কুর্নূল),
১৩. ৩. ৫৬

নারীদের নীতিবোধ বেশী

প্রশ্ন: নীতির কথা যেদিন থেকে উঠেছে সেদিন থেকেই নারীরা বাড়ীর বাইরে পা বাড়ায় না। তাহলে কী করা যাবে?

বিনোবা: নীতির ব্যাপারে নারীদের মধ্যে 'সুপিরিয়রিটি কমপ্লেক্স'

আছে। মনে হয় এজন্য পুরুষরাই দায়ী। কোন মা তার ছেলে খারাপ হয়ে যাওয়ার খবরে যত দুঃখ পান তার চেয়ে ঢের বেশী দুঃখ পান মেয়ে খারাপ হওয়ার খবরে। অর্থাৎ পুরুষদের সম্বন্ধে নারীদের মনে 'হীন কল্পনা' থাকে। পুরুষ কোন খারাপ কাজ করলে মেয়েরা অনায়াসে বলে দেবে—পুরুষের কাজই এমন। এভাবে মেয়েরা যে তাদের নীতিবোধের জন্য গর্ব করে তা ঠিকই করে। আমরা যেমন কোন জানোয়ার সম্বন্ধে বলে দিই—'এ ত জানোয়ারই', তেমন মেয়েরাও পুরুষদের সম্বন্ধে বলে দেয়। বিড়ি খাওয়ার আইনগত অধিকার থাকা সত্ত্বেও ভারতে কতজন বোন তা খায়? আইনের কড়াকড়ি না থাকা সত্ত্বেও পুরুষের মতো নারীরা নেশাখোর হয় না। কোন কোন জাতিতে এমন দেখা যায় যে, পুরুষরা মাংস খায়, কিন্তু মেয়েরা তা খায় না, রান্নাও করে দেয় না। এ অবস্থায় যে-পুরুষ কোনদিন রান্না করে না, তাকে অন্যত্র গিয়ে মাংস রান্না করে খেতে হয়। এভাবে এক প্রকারের ধর্মসংরক্ষণের বৃত্তি নারীদের মধ্যে দেখা যায়। পাশ্চাত্য শিক্ষাপদ্ধতিতে কিছু গুণের সমাবেশ থাকা সত্ত্বেও তাতে সমত্বের মূঢ় কল্পনা রয়েছে। ভারতীয় সংস্কৃতিতে এসব নেই, এসব আসার সম্ভাবনাও নেই। স্বাধীনতার পর আমাদের এখন উত্তরোত্তর দোষ মুক্ত হতে হবে। নারীদের মধ্যে যে নৈতিক শক্তি রয়েছে তাকে নষ্ট করে দিয়ে কোন লাভ নেই।

পুরুষ অপেক্ষা নারী শ্রেষ্ঠ

হয়ত অজ্ঞাতসারেই বর্ণব্যবস্থায়ও একপ্রকারের বৈষম্যকে স্বীকার করে নেওয়া হয়েছে। পুরানো প্রথা অনুসারে 'অনুলোম বিবাহ' অর্থাৎ উচ্চবর্ণের ছেলের সঙ্গে নিম্নবর্ণের মেয়ের বিয়ে হতে পারত। কিন্তু 'প্রতিলোম বিবাহ' অর্থাৎ নিম্নবর্ণের ছেলের সঙ্গে উচ্চবর্ণের মেয়ের বিয়ে হতে পারত না। এতে ত নারীদের শ্রেষ্ঠত্ব স্বীকারই করে নেওয়া হয়েছে। এমন ছিল যে ব্রাহ্মণ সর্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ, তার কিছু নীচে ক্ষত্রিয়, তার নীচে বৈশ্য এবং

তারও নীচে শূদ্র। কিন্তু নারী ত পুরুষ অপেক্ষাও শ্রেষ্ঠ ছিল। অর্থাৎ কোন নারী ব্রাহ্মণ হলে তিনি অতিশয় শ্রেষ্ঠ। কাজেই কোন ক্ষত্রিয় পুরুষকে তিনি বিয়ে করতে পারতেন না। কিন্তু তিনি ক্ষত্রিয় হলে ব্রাহ্মণ পুরুষকেও বিয়ে করতে পারতেন। এতে মেয়েদের শ্রেষ্ঠত্ব স্বীকৃতি পেয়েছে। এবং তা ঠিকই হয়েছে। সন্তানকে গর্ভে ধারণ ও কোলেপিঠে রেখে লালন করার দায়িত্ব যেব্যক্তির উপর রয়েছে, তিনি ত দায়িত্বরহিত ব্যক্তি থেকে শ্রেষ্ঠই। ব্যবহারিক দৃষ্টিতে এ গৃহীত হওয়ার পর আধ্যাত্মিক দৃষ্টিতেও নারীকে পুরুষ অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ বললে পুরুষদের এ নিয়ে ঝগড়া করার কিছু নেই। শ্রেষ্ঠত্ব সম্বন্ধে নারীরা অহংকার রাখবে না বটে, কিন্তু সচেতন থাকবে এবং পুরুষদের মর্যাদায় প্রতিষ্ঠিত হতে সাহায্য করবে।

কোন কোন সমাজশাস্ত্রজ্ঞের বিচারে স্থূলতা থাকে। তাঁর আধ্যাত্মিক বিচারের সঙ্গে মৌলিক মূল্যের সঙ্গে কোন সম্বন্ধ থাকে না। যেমন, ভারতে নারী অপেক্ষা পুরুষের সংখ্যা বেশী বলে সমাজশাস্ত্রীরা বলেছেন যে, মেয়েরা যদি ব্রহ্মচারিণী হতে থাকেন তবে ছেলেদের স্ত্রীহীন থাকতে হবে এবং পরিণামে সমাজে বিপদ দেখা দেবে। সুতরাং মেয়েদের বিয়ে করতেই হবে। এভাবে একই বিষয়ে অর্থাৎ ব্রহ্মচর্যের প্রশ্নে তাঁরা নারীদের বিপক্ষে এবং পুরুষদের পক্ষে। পুরুষদের পক্ষে ব্রহ্মচারী থাকা ঠিকই, কারণ নারীর সংখ্যা কম! যদি সবাই বিয়ে করতে চায় তবে পুরুষদের মধ্যে প্রতিদ্বন্দ্বিতার সৃষ্টি হবে, কাজেই সমাজশাস্ত্রের দৃষ্টিতে কিছুসংখ্যক পুরুষের ব্রহ্মচারী থাকা ইষ্টই। ভারতে যে পুরুষদের মধ্যে বহুবিবাহ প্রথা প্রচলিত হয়েছিল তা এরূপ বিচার-বিভ্রম থেকেই এসেছিল। হিন্দু-ধর্ম কখনো একে শ্রেষ্ঠ বলে স্বীকার করেনি।

তাছাড়া একই অপরাধে পুরুষদের চেয়ে নারীদের লাঞ্ছনা ভোগ করতে হয়েছে বেশী। এরজন্যও নারীরা পুরুষদের নিম্নকোটির বলে মনে করেছে এবং সাবধানে থাকার চেষ্টা করেছে। তাদের এরকম করা উচিতই হয়েছে।

অসত্যের মতো পাপ নেই

পরিত্রাণালয়ের নারীদের পুনর্বাসন কি করে করা যায়? এ বিষয়ে আমার দৃষ্টিভঙ্গী বৈপ্লবিক। আমার কাছে সর্বাপেক্ষা বড়ো ধর্ম—সত্য, আর সর্বাপেক্ষা বড়ো অধর্ম—অসত্য। অসত্যের তুলনায় ব্যভিচারও বড়ো পাপ নয়। কিন্তু আজকাল অসত্যের গুরুত্বকে গৌণ করে দিয়ে ব্যভিচার, হত্যা ইত্যাদিকে বড়ো পাপ বলে মনে করা হচ্ছে। পরিণামে সমস্ত পাপকেই লুকাবার চেষ্টা করা হয় এবং ফলে তা সংশোধিত হতে পারে না। রোগাক্রান্ত হলে আমরা তা লুকাই না, কারণ আমরা রোগ থেকে মুক্ত হতে চাই এবং তাতে লোকেদের সাহায্যও আশা করি। সেরকম আমরা যদি কোন নৈতিক দোষ করে ফেলি, তবে সংশোধনের জন্য তা মা-বাবা ও বন্ধুদের কাছে প্রকাশ করে ফেলা উচিত। কিন্তু প্রকাশ পেলে সবাই ঘৃণা করবে এই ভয়ে আজকাল এসব দোষ-ত্রুটি চেপে রাখার এক স্বাভাবিক প্রবণতা দেখা দিয়েছে। কুষ্ঠরোগী নিজের রোগের কথা অন্যকে জানাতে চায় না, কারণ সমাজে এরজন্য ঘৃণা রয়েছে। ফলে একদিকে যেমন রোগের কথা সহজে কেউ জানতে পারে না, অন্যদিকে তেমন বেশী বেড়ে যাওয়ার ফলে রোগও সারতে চায় না। অথচ প্রথমেই জানিয়ে দিলে রোগ সেরে যেতে পারে। সুতরাং নৈতিক পাপ বা দোষ কিছু হলে তাও লুকানো উচিত নয়। কারণ এতে সবচেয়ে বড়ো পাপ যে অসত্য সেদিকেই লক্ষ্য থাকে না।

কাজেই এমন সমাজ গড়ে তুলতে হবে যাতে কোথাও পাপ বা কোন দোষ হয়ে গেলে তাকে কেউ ঘৃণার চোখে না দেখে। কারো ভুল হলে আমরা যেমন তা ঠিক করে দিই, তার প্রতি মমতা প্রদর্শন করি, পাপ সম্বন্ধেও তেমন হওয়া চাই। সত্যের মহিমা বাড়াতে হবে আর বুঝতে হবে যে অসত্য সর্বাপেক্ষা বড়ো পাপ।

ছোটো ছেলেদের ভুলত্রুটি হলে তাদের মারধর করা উচিত নয়। বিশ বছর বয়স পর্যন্ত ছেলেদের কোন নৈতিক দোষকে খেলার-ত্রুটি হিসেবেই

ধরা উচিত। সমাজে যদি দোষ-ত্রুটিগুলি লুকিয়ে রাখার চেষ্টা চলে, তবে আড়ালে পাপ বেড়েই যেতে থাকবে। তাই, পরিত্রাণালয়ের বোনেরা কৃপার পাত্রী, ঘৃণার নয়—একথা মনে রেখে কাজ করতে হবে।

গত দাঙ্গা-হাঙ্গামায় হিন্দুরা মুসলমান বোনেদের আর মুসলমানেরা হিন্দু বোনেদের জোর করে নিয়ে গিয়েছিল। পরে যখন খোঁজ খবর করার কাজ আরম্ভ করা হল তখন মুসলমানেরা বোনেদের ফিরিয়ে নিতে রাজী হল, কিন্তু হিন্দুরা রাজী হল না। ফিরিয়ে নিতে রাজী হওয়ার জন্য হিন্দুদের অনুরোধ করা হল। এ সম্বন্ধে হিন্দুদের দৃষ্টিভঙ্গী ত্রুটিপূর্ণ ছিল। ঐসব বোনেরা নিজেদের ইচ্ছায় যায়নি, তাদের জোর-জবরদস্তি করে নিয়ে যাওয়া হয়েছিল এবং সেখানে তাদের ছেলেপুলে হয়েছিল। এ সত্ত্বেও তাদের পতিতা বলে মনে করা উচিত নয়—এভাবে হিন্দুদের বুঝাতে হয়েছে। এধরণের অনুদার বৃত্তি থেকে মুক্ত থাকা চাই। রোগীদের জন্য চিকিৎসালয় যেভাবে চালানো হয়, 'রেস্ক্যু হোম'-গুলোকেও সেভাবে দয়া ও সহানুভূতির দৃষ্টি দিয়ে দেখতে হবে।

নারীশিক্ষা

বৈদিক যুগে নারীরা খুবই জ্ঞানসম্পন্না ছিলেন। উল্লেখ আছে যে, যাজ্ঞবল্ক্যের সভায় চর্চা চলছিল তখন গার্গী দাঁড়িয়ে উঠে যাজ্ঞবল্ক্যকে বললেন, 'কাশী বা বিদেহের (মিথিলার) বীর ক্ষত্রিয়েরা যেমন তীর নিক্ষেপ করে, আমিও তেমন আপনাকে প্রশ্নরূপী বাণ নিক্ষেপ করছি।' এই বলে গার্গী দুইটি প্রশ্ন করলেন এবং যাজ্ঞবল্ক্য তার উত্তর দিলেন। তখন যাজ্ঞবল্ক্য দৃঢ় কণ্ঠে উপস্থিত পণ্ডিতদের সম্বোধন করে বললেন, 'এর চেয়ে কঠিন প্রশ্ন আর হতে পারে না। এখন আমার সঙ্গে চর্চা বন্ধ রাখুন এবং ওঁকে নমস্কার করুন।' গার্গী বীরের মতো দাঁড়িয়ে অত্যন্ত প্রত্যয়ের সঙ্গে বলেছিলেন —'আমার চেয়ে কঠিন প্রশ্ন আর কে জিজ্ঞেস করবেন?' সে ছিল বেদ উপনিষদের যুগ, আর এখন?

গার্গীর কাহিনী পড়ে ভাবলাম, ঐ যুগে গার্গীর প্রশ্ন সবাপেক্ষা কঠিন ছিল এবং যাজ্ঞবল্ক্য তার উত্তর দিতে পেরেছিলেন। কিন্তু এই যুগে কি এমন কোন গার্গীর আবির্ভাব হবে না যাঁর প্রশ্নের উত্তর কোন যাজ্ঞবল্ক্য দিতে পারবেন না এবং পরাজয় স্বীকার করবেন?

নারীদের কাছে আমার আন্তরিক আবেদন এই যে, তাঁরা যেন অখণ্ড জ্ঞানের স্পৃহা রাখেন, জ্ঞান-তৃষ্ণা কখনো নষ্ট হতে না দেন। জ্ঞানের উপাসনাদ্বারাই তাঁরা দুনিয়া জয় করতে পারেন।

সফদরগঞ্জ (বারাবংকী),

৪. ৫. ৫২

নারীশিক্ষা ও তার স্বরূপ

প্রশ্ন: মহিলাশিক্ষার স্বরূপ কী হবে? মেয়েদের কি উত্তম মা হওয়ার

শিক্ষা দেওয়া হবে? না, তারা যাতে চাকুরীজীবী হতে পারে সেভাবে শিক্ষা দেওয়া হবে?

বিনোবা: নারী ও পুরুষের শিক্ষণীয় বিষয়বস্তু বেশীর ভাগ একই ধরনের থাকে। সামান্য অংশই ভিন্নধরনের, বিশেষ ধরনের হয়। প্রথমে যে শিক্ষা একই ধরনের অর্থাৎ নারী-পুরুষ উভয়ের পক্ষেই গ্রহণীয় সে সম্বন্ধে আলোচনা করছি। নারী ও পুরুষ উভয়ের আত্মা সমান সংস্কারবান। এ বিষয়ে উভয়ের মধ্যে কোন পার্থক্য নেই। এ হচ্ছে প্রথম মিলের কথা। দ্বিতীয় মিল হচ্ছে বাসনা সম্বন্ধে—ক্ষুধা-তৃষ্ণা প্রভৃতি দুজনের মধ্যেই সমান রয়েছে। তৃতীয় মিল, দুজনের সৃষ্টির সঙ্গে সম্পর্ক অর্থাৎ বিজ্ঞানের সম্পর্ক এক। সৃষ্টি যে নারীর চোখে একরকম আর পুরুষের চোখে অন্যরকম তা নয়।

সহশিক্ষা

এর থেকে স্পষ্ট বুঝা যাবে যে, নারী ও পুরুষের অধিকাংশ শিক্ষণীয় বিষয়ই এক। গুণবিকাশের জন্যও দুজনকে একই নিয়ম মেনে চলতে হয়। এসব বিচার করে আমি ত বলব যে নারী-পুরুষের সমান শিক্ষা পাওয়া উচিত এবং তা একই সঙ্গে পাওয়া উচিত।

কেউ কেউ প্রশ্ন তোলেন—সহশিক্ষা কি ভালো? কিন্তু আমি বুঝতেই পারিনা এরকম প্রশ্ন কেন ওঠে। এর উত্তর ত ভগবান নিজেই দিয়েছেন। তিনি যদি সহশিক্ষা না চাইতেন, তবে কোন কোন ঘরে কেবল ছেলে পাঠাতেন আর কোন কোন ঘরে কেবল মেয়ে। তা না করে তিনি ত প্রত্যেক ঘরেই ছেলে-মেয়ে উভয়কেই পাঠান। অন্তত এ দেখেও আমরা বুঝতে পারি যে, ঈশ্বরের ইচ্ছানুসারে ছেলে-মেয়েদের শিক্ষা একসঙ্গেই হওয়া উচিত। শিক্ষার সুযোগ উভয়কেই সমানভাবে দিতে হবে এবং তারা তাদের নিজ নিজ যোগ্যতা অনুসারে এগুবে, বিকাশ লাভ করবে। কৃত্রিম উপায়ে ছেলে ও মেয়েদের আলাদা করে

রাখলে তাতে তাদের বিকাশ নয় বিকার পোষণ করা হবে অর্থাৎ তারা অতি-একাঙ্গী শিক্ষা লাভ করবে।

শিক্ষার বিশেষ অংশ কর্মযোগে

ছেলে ও মেয়েদের শিক্ষার মধ্যে কিছু পার্থক্য আসে কর্মযোগে। দৈহিক গঠনে পার্থক্যহেতু কিছু-কিছু কাজ ছেলে ও মেয়েদের জন্যে আলাদা থাকবে। এর মানে এ নয় যে, আজকাল যেমন চলছে তেমন প্রত্যেক কাজ আলাদা করে দেওয়া আমি পছন্দ করি। দৃষ্টান্তস্বরূপ রান্নাবান্নার কাজ ধরা যেতে পারে। সাধারণত মেয়েরাই একাজ করে; কিন্তু তা বলে এ নিশ্চয় করে দেওয়া ঠিক হবে না যে রান্নাবান্নার কাজ কেবল মেয়েদেরই। একাজে ছেলেদেরও পটু হতে হবে। এ এক উৎপাদক কাজ। এতে নতুন কিছু উৎপাদন হয় না ঠিকই। কিন্তু নতুন উৎপাদন ত একমাত্র পরমেশ্বরই করেন। মানুষ কেবল রূপান্তর করে। যেমন—গম থেকে আটা ও রুটি, কাঠ থেকে টেবিল, অথবা কার্পাস থেকে সুতো ও কাপড় বানানো হয়। তেমনি রান্না উৎপাদনের শেষের কাজ। শেষের কাজে ত্রুটি হলে চলে না। সুসংস্কৃত ও সম্পূর্ণ নির্দোষ রাখার মতো যে উৎপাদক কাজ রান্না, সে কাজ থেকে আমরা ছেলেদের কী করে বঞ্চিত রাখতে পারি? এতে তাদের উপর অন্যায় করা হবে। তাছাড়া এভাবে যদি ছেলে ও মেয়েদের কাজ আলাদা-আলাদা করে দেওয়া হয়, তবে সমাজও টুকরো হয়ে যাবে আর তার এক অংশ বোঝাস্বরূপ হয়ে থাকবে। ছেলেদের এ কাজকে অবজ্ঞা করা উচিত নয়। রান্নার প্রধান দায়িত্ব মেয়েদের উপর থাকে ত তাতে আমার আপত্তি নেই। কিন্তু এ যেন মনে করা না হয় যে রান্না কেবল মেয়েদেরই কাজ। কর্মযোগে কোন কাজে নারীর ও কোন কাজে পুরুষের প্রাধান্য থাকবে, কিন্তু একেবারে ভাগাভাগি না হয়ে যাওয়া চাই। কারণ এতে আত্মাই খণ্ডিত হয়ে যাবে।

কেবল দৃষ্টান্ত হিসাবেই রান্নার কথা বললাম। ঘরের সব কাজেই ছেলেদের অবশ্যই অংশ গ্রহণ করতে হবে। মেয়েদেরও তেমন বাইরের কাজে অংশ গ্রহণ করা চাই। কিন্তু কে কোনটার উপর জোর দেবে সেটাই আসল কথা!

শস্যের কাজ, ছুতারের কাজ, বুনাই-সেলাই প্রভৃতির কাজ মেয়েরা ভালোভাবে করতে পারে। আজকাল কল-কারখানাগুলি যেমন গ্রামোদ্যোগ ও কুটীরশিল্পের উপর আক্রমণ চালিয়েছে, শহরগুলি গ্রামগুলির উপর আক্রমণ করছে, তেমন পুরুষরাও নারীদের উপর একরকম আক্রমণ চালিয়ে যাচ্ছে। ধীরে ধীরে সমস্ত কাজ পুরুষদের হাতে চলে যাচ্ছে। নারীদের হাতে এক রান্নার কাজ ছাড়া আর কোন কাজ অবশিষ্ট নেই। আমি এ কথা বলছিনা যে, পুরুষরা আগের থেকে ভেবে-চিন্তে ঠিক করে নিয়ে পরে নারীদের হাত থেকে কাজগুলি কেড়ে নিয়েছে। নারীরা কিছু কলাত্মক কাজ পুরুষদের অপেক্ষা ভালো করতে পারে। আঁকার কাজ, সূতাকাটার কাজ প্রভৃতি কলাত্মক ও সামাজিক কাজ তারা বিশেষরূপে করতে পারে। পুরুষরা এসবে ভিড় না করলে এতে নারীরা স্বাবলম্বী হওয়ার সুযোগ পাবে।

রাষ্ট্ররক্ষার কাজ পর্যন্ত নারীদের দ্বারা হতে পারে। আজ পর্যন্ত দেশরক্ষার কাজ হিংসার সাহায্যে করা হয়েছে এবং দেহে শক্তি কম বলে নারীদের তাতে আমল দেওয়া হয়নি। কিন্তু অহিংসার নতুন পথ আবিষ্কৃত হওয়ার পর এইদিকও তাদের জন্য খুলে গেছে। সমাজ রক্ষা প্রভৃতি কাজে নারীদের ত বেশী অংশ গ্রহণ করতেই হবে। আর তখনই দুনিয়া হিংসার হাত থেকে রক্ষা পাবে। এসব কাজ এতদিন কেবল পুরুষরা করেছে বলে দ্বেষ বৃদ্ধি পেয়েছে। এতে নারী ও পুরুষের স্থান সমান হওয়া চাই। একটি অতি বিশিষ্ট কাজ নারীদের জন্য রয়েছে, তা হচ্ছে ছেলেপুলেদের শিক্ষার কাজ। বুনিয়াদী শিক্ষার দায়িত্ব নারীদের উপরই থাকা উচিত।

সিংহ, বাঘ প্রভৃতি জন্তুদের মধ্যে দেখা যায় যে মাদীরাই বাচ্চাদের লালন-পালন করে এবং নিজেদের খাবারও নিজেরাই শিকার করে নেয়। পশুরা যেসব

খারাপ কাজ করে তা আমরা অনুকরণ নিশ্চয়ই করব না, কিন্তু তাদের ভালো কাজগুলো ত করতে পারি। জীবিকা সম্পাদনের দায়িত্ব থেকে নারীদের মুক্ত হওয়ার প্রয়োজন নেই। হাঁ, নারীদের অবশ্যই সহায়তা পাওয়া চাই। বর্তমানে মেয়েদের যে কম মজুরী দেওয়ার রেওয়াজ চলেছে তা একেবারেই বিপরীত ব্যবস্থা এবং অন্যায় কাজ করা হচ্ছে।

পুরুষ অপেক্ষা নারীদের মধ্যে একাগ্রতা বেশী। এ এক ঐশ্বরিক বস্তু। শিশুদের লালনপালন করা একাগ্রতা-গুণ ছাড়া হতেই পারে না। এই গুণ থাকার দরুন নারীদের পক্ষে ধ্যানযোগ ও ভক্তিযোগ অধিক অনুকূল। কর্মযোগেও যেখানে একাগ্রতার প্রয়োজন বেশী সেখানে মেয়েরা কুশলতার সঙ্গে কাজ করতে পারে। সর্বাপেক্ষা শেষের কাজ, ফিনিশিং মেয়েরা ভালোভাবে করতে পারে।

শিশু পালনাদি কিছু কাজ নারীদের জন্য বিশেষ কাজ। এ বিষয়ে নারীদের জ্ঞান বেশী থাকবে, কিন্তু পুরুষদেরও থাকা চাই। বাকী সমস্ত শিক্ষা একসঙ্গেই হতে পারে।

কাশী বিদ্যাপীঠ (কাশী),
২৭. ৮. ৫২

স্বাতন্ত্র্য রক্ষা ও স্বতন্ত্র বুদ্ধি

প্রশ্ন: আজকাল নারী ও পুরুষকে একই ধরনের শিক্ষা দেওয়া হয়ে থাকে। নারীরা যাতে তাদের স্বাতন্ত্র্য রক্ষা করতে সক্ষম হয় তাবজন্য কী করা যেতে পারে?

বিনোবা: স্বাতন্ত্র্য রক্ষার জন্য বোনেদের স্বতন্ত্র বুদ্ধি রাখতে হবে। তাদের এ বুঝে নেওয়া চাই যে ভগবানের সঙ্গে তাদের সরাসরি সম্বন্ধ রয়েছে, মাঝখানে পুরুষের দরকার নেই। নারীরা মনে করে ভগবানের সঙ্গে তাদের যে সম্বন্ধ তা পুরুষদের প্রতিনিধিসাপেক্ষ। এ ধারণা ছাড়তে হবে।

একই ঘরে ছেলে-মেয়ে উভয়েই জন্মগ্রহণ করে। ছেলে খোলা হাওয়ায় বেড়াতে যাবে তাতে কোন বাধা নেই, কিন্তু মেয়ের বেলায় তাকে নানা অঙ্গরাগ, আভরণাদিতে সাজিয়ে আটকে রেখে বুঝিয়ে দেওয়া হবে যে সে মেয়ে। এমন কেন হয়? ছেলে যেমন, মেয়েও তেমন। রাত্রিকালে ছেলেকে কোন কাজের প্রয়োজন হলে ষ্টেশনে পাঠাতে পারি, কিন্তু মেয়েকে পাঠাতে পারি না। এভাবে পুরুষেরা নারীদের ভীরু বানিয়ে রেখেছে এবং ব্যাঙ্কে পরিণত করেছে। নারীদের নাকে, কানে, গলায়, হাতে, পায়ে ও মাথায় সোনার বেড়ি লাগিয়েছে যাতে তারা পুরুষদের মুঠোয় থাকে এবং ঘরের বাইরে একা-একা না যেতে পারে। অবস্থা এমন হয়ে দাঁড়িয়েছে যে অলংকারাদিকে আমরা সৌভাগ্যের চিহ্ন বলে মনে করি। কিন্তু পুরুষদের বেলায় যখন এসব সৌভাগ্যচিহ্নের প্রয়োজন হয় না, তখন নারীদের বেলায়ই বা কেন প্রয়োজন হবে। পুরুষদের কি সৌভাগ্যের প্রয়োজন নেই? শৈশব অবস্থা থেকে মেয়েদের যে সাজসজ্জার পুতুল বানিয়ে রাখা হয় তা তাদের ভীরু করে রাখার জন্যই। মেয়েদেরই এসব পরিহার করে নির্ভীক হতে হবে।

মহিলা সভা (বাঙ্গালোর),
১৬ ১০, ৫৭

মেয়ে ও বিদ্যালয়

প্রশ্ন: আমার মা বলতেন—মেয়েদের আবার বিদ্যালয়ে যাওয়ার দরকার কি? তাদের ত পতির আলয়েই যেতে হবে।

বিনোবা: আমি স্বীকার করি যে, স্বামীর ঘরেও মেয়েরা অনেক শিক্ষা লাভ করবে। কিন্তু পুরুষের সেবা করাই নারীদের ধর্ম—এই যে এক ধারণা, এ একেবারে ভুল। আত্মায় নারী-পুরুষের ভেদ হয় না।

এ ঠিক কথা যে মাতৃত্বও এক মহৎ বস্তু। এ যোগ্যতাকে আমি কম বলে মনে করি না। সীতা, সতী, সাবিত্রী প্রভৃতি আমাদের যে আদর্শ, তার মূলে

রয়েছে ব্রহ্মচর্যের আদর্শ। পুরুষ ঈশ্বরের নামে দুনিয়াময় ঘোরে, নারীদের মধ্যেও সেরকম কোন আদর্শ থাকা উচিত। মীরাবাঈ-এর এক আদর্শ আমাদের সামনে আছে ঠিকই। কিন্তু তাঁকে ত হরিপাগল বলে সরিয়ে রাখা হয়েছে। ঐ অলৌকিক ও অদ্বিতীয় দৃষ্টান্ত নারীকে স্বাধীনতা দেওয়ার কাজে সাহায্য করেনি। মীরাকে কেউ অনুসরণ করেনি।

আমি মনে করি নারীদেরও স্বাধীনভাবে ব্রহ্মচর্য, সন্ন্যাস, বেদাভ্যাস, আত্মচিন্তা প্রভৃতিতে অধিকার থাকা উচিত। এর অভাব হেতু আমাদের প্রগতির পথে বিরাট প্রতিবন্ধক এসেছে। হিন্দুধর্মে নারীদের বৈধব্য অবস্থায় ব্রহ্মচর্যের অধিকার দেওয়া হয়েছে। কিন্তু এ-ই যথেষ্ট নয়। কারণ এ ত নিরুপায়ের উপায় হিসেবে করা হয়েছে।

বাৎসল্যভাব নারীদের মধ্যে স্বাভাবিক ভাবে থাকে। তারা যদি মা হয়, তবে তাতে কোন দোষ নেই; বরং এ তাদের গুণই। কিন্তু কেউ যদি ব্রহ্মচারিণী থাকতে চায়, তবে তাতে বাধা দেওয়া হবে কেন? যেহেতু মেয়ে সেহেতু তাকে অন্যের ঘর করতেই হবে—এ ঠিক কথা নয়।

কাশী বিদ্যাপীঠ (কাশী)

২৭. ৮, ৪২

ভক্তি ও আত্মজ্ঞান প্রয়োজন

মনোহরজী আমাকে বলেছিলেন যে, বিহারে কিছু মেয়ে ক্যাথলিক হয়ে গেছে। এখন তারা নারীজাতির সেবায় আত্মনিয়োগ করেছে এবং তারা ব্রহ্মচারিণীই থেকে যেতে পারে। হিন্দুদের মধ্যে কেন এমন হয় না? ক্যাথলিক সম্প্রদায়ের মধ্যে কি যাদু আছে যে সেখানকার বোনেরা যা করতে পারে হিন্দু সম্প্রদায়ের বোনেরা তা করতে পারে না? এর কারণ ত স্পষ্ট যে ক্যাথলিকধর্মে মেয়েদের পক্ষে ব্রহ্মচারিণী থাকার কোন বাধা নেই। জৈন ও বৌদ্ধধর্মের কোন বাধা নেই। কিন্তু হিন্দুধর্মে আছে। প্রাচীনকালে

হিন্দুধর্মে একরকম হত। মুসলমানদের মধ্যেও এ পথ একেবারে খোলা নেই। আজকাল যে শিক্ষা দেওয়া হয়, তা সেবার শিক্ষা। কিন্তু ভক্তি ও আত্মজ্ঞান ছাড়া যে সেবা, তা সাংসারিক সেবা হয়ে যায়। সংসারের ঊর্ধ্বে উঠে সামাজিক রূপ দেওয়ার, সমাজে ক্রান্তি (বিপ্লব) আনার সুযোগ তাতে থাকে না। বোনেদের এরজন্য ভক্তি ও আত্মজ্ঞানের শিক্ষা প্রয়োজন।

পণ্ঢরপুর,

৩১. ৫. ৫৮.

আধ্যাত্মিক শিক্ষার রূপ

নারীশিক্ষায় আধ্যাত্মিক শিক্ষার স্থান সর্বাগ্রে। আমাদের দেশে নারীরা আত্মপরায়ণ হতেন। মহাভারতে দেখা যায় সুলভা জনক রাজার জ্ঞানদাত্রী ছিলেন। এধরণের আরও অনেক কাহিনী আছে। ভারতে এক যুগে নারীদের এমন গৌরব ছিল। এখন সেদিন নাই। কিন্তু প্রথম প্রয়োজন অধ্যাত্ম-জ্ঞানেরই। আমরা দেহ থেকে ভিন্ন, অবিনাশী, আত্মরূপ। আমাদের অন্তরে পরমেশ্বর বিরাজমান। এজন্যেই তাঁর দর্শন সুলভ। সমস্ত জীব আমাদের রূপ। এই অধ্যাত্মবিচারে বোনেদের দক্ষ হতে হবে। শিক্ষার মূল ভিত্তি হবে আত্মার জ্ঞান। যাতে বর্তমান সমাজের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করবার শক্তি নারীদের মধ্যে আসে তার জন্য নারীশিক্ষায় কঠোর সত্যনিষ্ঠা ও জীবনতপস্যার প্রয়োজন। যিনি অধ্যাত্মবিদ্যার অধিকারী তাঁকে সারা দুনিয়াও যদি চেষ্টা করে তবু দাবিয়ে রাখতে পারে না। আমার বিশ্বাস অধ্যাত্মবিদ্যাদ্বারা আমরা জোরালো বিপ্লব সৃষ্টি করতে পারি। এ সম্বন্ধে বিভিন্ন পুস্তক থেকেও সাহায্য নেওয়া যায়। ভালো ভালো গ্রন্থ আছে—গীতা, উপনিষদ এবং আধুনিকালেরও বই রয়েছে। কিন্তু গ্রন্থ নয়, বিচারই আসল। যদি তা পাওয়া যায়, তবেই ভবিষ্যতের কাজ ঠিকভাবে চলতে পারে।

নারীদের কর্তব্য

সাংস্কৃতিক যাকিছু আছে তার সমস্ত দায়িত্ব নারীদের গ্রহণ করতে হবে। দৃশ্যত আজ পর্যন্ত এসব ক্ষেত্রে পুরুষদেরই প্রাধান্য চলে এসেছে, নারীরা রয়েছে নেপথ্যে। পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ কাব্য, যার প্রভাব সমস্ত দুনিয়ার উপর রয়েছে, তা বাল্মীকি রামায়ণ হোক, ব্যাসদেবের মহাভারত হোক বা হোমার, দান্তে, মিল্টন প্রভৃতির কাব্য হোক সবই পুরুষের লেখা। বেদে কিছু নারী-ঋষিরও উল্লেখ পাওয়া যায়, যাঁরা মন্ত্র রচনা করেছেন। এর অনেক পরে কর্ণাটকের অক্ক মহাদেবী, রাজস্থানের মীরাবাঈ প্রভৃতির নাম পাওয়া যায়। কিন্তু তিন-চারজন ছাড়া সাহিত্যসৃষ্টিতে নারীদের অবদান খুবই কম দেখা যায়। বর্তমানে ইউরোপে মেয়েরা কিছু-কিছু লিখতে আরম্ভ করেছেন। এ তাঁদের এক সামাজিক সেবার কাজ বলা যায়।

শিশুশিক্ষার ভার

শিশুদের শিক্ষা দেওয়ার ভারও পুরুষদের হাতে রয়েছে। বস্তুত শিশুদের শিক্ষা দিতে পারে এমন কোন যোগ্যতা পুরুষদের আছে বলে মনে হয় না। শিশুরা বড়ো হলে তখন তার দায়িত্ব পুরুষদের পক্ষে নেওয়া সম্ভব হলেও হতে পারে, কিন্তু প্রাথমিক স্কুলের শিশুদের সঙ্গে কিরকম ব্যবহার করতে হবে তা পুরুষেরা কী জানবে? এর পুরা দায়িত্ব মেয়েদের হাতে আসা চাই। সাহিত্য, শিক্ষা, ধর্মীয় ব্যবস্থা প্রভৃতি ব্যাপারে নারীদের প্রাধান্য থাকা চাই।

নারীদের আশ্রম প্রতিষ্ঠা

নারীদের পক্ষে আশ্রম প্রতিষ্ঠা করা এক বিশেষ কাজ। নারী-পুরুষ উভয়কে নিয়েই গান্ধীজী আশ্রম খুলতেন। কিন্তু কোন নারী এরকম আশ্রম প্রতিষ্ঠা করেননি যেখানে নারী-পুরুষ উভয়েরই স্থান আছে। পণ্ডিতচেরীতে

মাতাজী আছেন, কিন্তু সে আশ্রম প্রতিষ্ঠা করেছেন শ্রীঅরবিন্দ। নারীরা বরাবরই ভক্ত ছিলেন, আজও আছেন। গান্ধীজীর আশ্রম দেশ গঠন করেছে। এর প্রভাব সারাভারতের উপর পড়েছে। ভারতের নানাস্থানে এমন কর্মীরা ছড়িয়ে আছেন যারা সবরমতীতে তিন-চার মাস বা দুই-এক বছর ছিলেন এবং সেখানকার প্রেরণায় অনুপ্রাণিত হয়ে কাজ করে যাচ্ছেন। দয়ারামের (স্বামী শ্রদ্ধানন্দের গুরুকুল, রবীন্দ্রনাথের শান্তিনিকেতন, শ্রীঅরবিন্দের আশ্রম ভারতের উপর যে প্রভাব বিস্তার করেছে, নারীদের বেলায় তেমন কেন সম্ভব হয় না? নারী-পুরুষের যে ভেদ রয়েছে যা কল্পনা মাত্র, তাও স্বীকার করে নেওয়া যেত যদি তাতে সমাজের কাজ ঠিক মতো চলত। কিন্তু এদিকে পুরুষদের বুদ্ধি বিবেচনা ত দেউলিয়া হয়ে গেছে। তারা নারীদেরও বন্দুক ধরতে বলছে। সুতরাং নারী পুরুষের পুরানো ভাগাভাগি এখন একেবারে অচল। এখন থেকে নারীদের এমন সব কাজের দায়িত্ব নেওয়া চাই যা পালন করলে সারাভারত প্রভাবিত হবে।

আজ পর্যন্ত সারাভারতে নারীদের অনুপ্রেরণায় এমন কোন প্রতিষ্ঠান গড়ে ওঠেনি যেখানে নারী-পুরুষ নির্বিশেষে শিক্ষা গ্রহণ করতে পারে। নারীদের উপর ঘরের দায়িত্ব, শিশু-পালনের দায়িত্ব রয়েছে এবং এ এক গুরু দায়িত্ব সন্দেহ নেই। আমি আমার মার প্রতি চিরকৃতজ্ঞ। এমন একটি দিনও আমার কাটে না যেদিন মার কথা মনে পড়ে না। এ এক অশেষ অনুগ্রহ। এ ত থাকবেই। নারীদের এ অধিকার কেউ কেড়ে নিতে পারে না। পুরুষেরা যদি পারত তবে তাও কেড়ে নিত। কিন্তু পরমেশ্বরের ব্যবস্থাপনাই এমন যে শিশু পিতৃগর্ভে নয় মাতৃগর্ভে জন্মলাভ করে। সুতরাং পুরুষেরা নারীদের অন্তত এ অধিকার থেকে বঞ্চিত করতে পারবে না। তারা অন্যসব কাজ থেকে নারীদের বঞ্চিত করেছে। এ অবস্থায় নারীরা যদি আশ্রম প্রতিষ্ঠা করে তবে তার বিরাট ও স্থায়ী প্রভাব এবং সাংস্কৃতিক প্রভাব সমাজের উপর পড়বে।

শান্তিসেনায় যোগ দাও

আজকাল শান্তিসেনার কথা চলছে। নারীদের শান্তিসেনার কাজে এগিয়ে আসতে হবে। বর্তমানে ভারতের যেকোন স্থানে যেকোন সময় দাঙ্গা-হাঙ্গামা লেগে যেতে পারে, গুলি চলতে পারে। বারুদ প্রস্তুত, একটু স্ফুলিঙ্গ হলেই হয়। এমন দেশে কোন কথারই কোন মূল্য থাকে না। নেতারা সব অক্ষম প্রমাণিত হয়েছেন। এক নেতা যা বলেন, অন্য নেতা তা ভাঙ্গেন। লোকপ্রিয় হওয়া এক কথা আর শব্দশক্তি অন্য কথা। গান্ধীজীর বাণীতে শক্তি ছিল। তাও শেষের দিকে কিছু ক্ষীণ হতে শুরু করেছিল। শব্দশক্তি খুবই বড়ো জিনিস এবং দেশে আজ তার অভাব রয়েছে। পাঞ্জাবে কি হচ্ছে? একেবারেই অর্থহীন ব্যাপার। ঝগড়া চলেছে গুরুমুখী লিপি নিয়ে যার এক-তৃতীয়াংশ অক্ষর নাগরী এবং এক তৃতীয়াংশ প্রায় নাগরীর মতোই। এরজন্য রাজনৈতিক বিদ্বেষ সৃষ্টি হচ্ছে, সত্যাগ্রহ চলছে, মারামারি হচ্ছে, গুলি চলছে। সম্প্রতি ডাক-কর্মচারীদের হরতাল হওয়ার কথা চলছিল। যদি তা হত তবে সারাভারতের কাজকারবার একদম বন্ধ হয়ে যেত এবং গোলমাল দেখা দিত। কারণ চিঠিপত্র বিনিময়ের উপর অনেক কিছু নির্ভর করে। এমনিতেই ত চিঠি-পত্র এখন সময় মতো পাওয়া যায় না। তারবার্তা পর্যন্ত লোক পৌঁছে যাওয়ার পর বিলি হতে দেখা যায়। এমন কি কোন-কোন সময় তা যথাস্থানে যায়ই না। সমস্ত কাজ এভাবে একেবারে ঢিলা হয়ে গেছে। ডাকবিভাগের কাজ ঢিলা হলে রাষ্ট্রই ঢিলা হয়ে যায়। বেতন কম বলে ডাক-কর্মচারীদের মধ্যে অসন্তুষ্টি আছে। তাঁদের দাবি ন্যায্য, কাজেই তাদের বেতন বাড়ানো উচিত। কিন্তু সঙ্গে-সঙ্গে দায়িত্ব বোধও বাড়াতে হবে। কিন্তু দেশে আজ দায়িত্ব সম্বন্ধে বোধই নেই। কাজ ক্রমাগতই কম করব আর ক্রমাগতই বেতন বেশী চাইব—দেশে আজ এরকম একটা প্রবৃত্তি দেখা দিয়েছে। আগুন লাগাবার বেলায় সবাই আছে, কিন্তু নেভাবার বেলায় কেউ নেই। এ অবস্থায় যেকোন সময় আগুন

লাগার খবর পাওয়া যেতে পারে। সেখবর শোনার পর দৌড়ঝাঁপ করে আর কি হবে! যা হল তা ত হয়েই গেল। এরজন্যই শান্তিসেনার প্রয়োজন।

বিচার বোঝা দরকার

শিক্ষার কাজ, আশ্রমের কাজ ও শান্তিসেনা তথা গ্রামদান প্রচারের মতো যত কাজ রয়েছে তা নারীদের করা চাই। আনন্দের কথা কিছু মেয়ে এ কাজে যোগদান করেছে। কিন্তু সকল মেয়েরই এ কাজের বিচার বুঝে নেওয়া দরকার। মেয়েদের উপর ঘরের দায়িত্ব ত আছেই, সেইসঙ্গে সমাজকে বাঁচাবার দায়িত্বও তাদের উপর রয়েছে। এ মনে রেখে তাদের কাজ করতে হবে। তারা যতটুকু এগিয়ে আসবে, তাদের নৈতিক প্রভাবও ততটুকু বাড়বে। এর পরিণামস্বরূপ সমাজে শান্তি বজায় থাকবে। তাই শান্তিসেনায় মুখ্যত নারীদেরই এগিয়ে আসা উচিত। নারী-শক্তিকে জাগিয়ে তোলাই ছিল গান্ধীজীর বৈশিষ্ট্য। আর তিনি যে নারী-শক্তিকে জাগাতে পেরেছিলেন তার কারণ গান্ধীজীর সমস্ত কাজই ছিল অহিংসার। সমাজ যতদিন হিংসার উপর নির্ভর করে চলবে ততদিন নারীদের স্থান গৌণ হয়ে থাকবে। এক ঝাঁসীর রাণীকে আমরা দেখতে পাই। কিন্তু তার সংখ্যা বেশী হতে পাবে না। যদি আমরা চাই যে হিংসা-শক্তি দ্বারা সমাজকে বাঁচাতে হবে, তবে সেকাজে পুরুষদেরই প্রাধান্য থাকবে, নারীদের স্থান হবে গৌণ। কিন্তু অহিংসায় নারীরা অনেক বেশী সুযোগ পাবে। গান্ধীজী সমস্ত সামাজিক ক্ষেত্রে অহিংসাকে মেনে চলতেন বলেই নারীশক্তিকেও জাগাতে পেরেছিলেন। ব্যক্তিগত ক্ষেত্রে অহিংসা ত প্রথম থেকেই স্বীকৃতি পেয়েছিল। কিন্তু গান্ধীজী অহিংসাকে সামাজিক ক্ষেত্রে এনেছেন। এখন নারীরা পুরুষের সমান বা কিছু বেশীই কাজ করতে পারে। গ্রামদানে তাঁদের কাজ করার অনেক কিছু আছে। আমি এ কথা বিহারের অভিজ্ঞতা থেকে বলছি। পর্দা প্রথার দরুন সেখানকার মেয়েরা

বাইরে আসে না। পুরুষ কর্মীরা বাড়ীর ভেতর যেতে পারে না, তাদের বাইরেই থাকতে হয়। এ অবস্থায় সেখানে বোনেরা অনেক কাজ করেছে, কারণ তারা অন্দরে পৌঁছে যেত। সন্তানদের ভবিষ্যৎ নিয়ে সাধারণত মায়েরাই বেশী চিন্তা করেন। কাজেই তাঁদের সঙ্গে দেখা-সাক্ষাৎ ও আলাপ আলোচনা না হলে ভূদান-গ্রামদান সহজে হতে পারে না। পুরুষ কিছু দিয়ে দেয়, কিন্তু বিশেষ দান স্ত্রীদের সম্মতি ছাড়া দিতে পারে না।

এভাবে কাজ করার আজ অনেক সুযোগ নারীদের সামনে খুলে গেছে গ্রামদান তথা শান্তিসেনা, আশ্রম ও শিক্ষা এই ত্রিবিধ কাজ তাদের করা চাই। এ পর্যন্ত তারা গৌণভাবে অংশ গ্রহণ করেছে, কিন্তু এখন তাদের মুখ্য হতে হবে।

মহীশূর, ২৬. ৯. ৫৭.

নারীর জীবিকা নারীর হাতে থাকবে

শহরের লোকেরা যেমন গ্রামের জীবিকা কেড়ে নিয়ে গেছে, তেমন পুরুষরাও নারীদের জীবিকা হরণ করে নিয়েছে। আগে পুরুষরা করত চাষ-আবাদের কাজ আর নারীরা তাঁতের কাজ। বেদে যেখানে যেখানে বয়নের উল্লেখ আছে, সেখানেই 'বয়নকারিণী' শব্দের ব্যবহার করা হয়েছে। ইংরেজীতেও পুরুষের জন্য 'হাজব্যাণ্ড' (husband) অর্থাৎ কৃষক, আর স্ত্রীর জন্যে 'ওয়াইফ' (wife) অর্থাৎ 'বয়ণকারিণী' শব্দ রয়েছে। কিন্তু পরবর্তী যুগে পুরুষেরা বোনার কাজ শুরু করে দিল আর মেয়েদের উপর পড়ল সুতো ভরার কাজ। অর্থাৎ তাঁতের কাজে মুখ্য হল পুরুষ আর নারী হল গৌণ। সুতো ভরার কাজে বেশী সংখ্যক কর্মীর প্রয়োজন হয় বলে তন্তুবায়দের মধ্যে একাধিক স্ত্রী রাখার প্রথা প্রচলিত হল। এভাবে নারীর স্থান হয়ে গেল গৌণ। আগে সেলাইয়ের কাজ মেয়েদের হাতে

ছিল, কিন্তু অধুনা সেলাই-কল হওয়ার পর তাও পুরুষদের হাতে চলে গেছে। যন্ত্রের বিরুদ্ধে আমার কোন অভিযোগ নেই। কিন্তু মেয়েদের কাজ তাদের হাতেই থাকা উচিত। রান্নার কাজ মেয়েদের বলে মনে করা হয়, কিন্তু হোটেল খোলার পর সেইকাজও পুরুষরা করছে। আমার কথা হচ্ছে, যে-কাজ মেয়েদের পক্ষে উপযুক্ত তা তাদের জন্যই থাকা উচিত। এতে তাদের স্বতন্ত্র প্রতিষ্ঠা থাকবে। অন্যথায় সমস্ত কাজ পুরুষদের হাতে চলে যাবে আর মেয়েদের চিরদিন পরাধীন ও পুরুষাধীন হয়ে থাকতে হবে। এদের পরাধীন থাকা উচিত—এই যদি আপনারা মনে করেন, তাহলে আমি পুরুষদের বলব, 'আপনারা গ্যারাণ্টি দিন যে, প্রত্যেক শিশু বড়ো না হওয়া পর্যন্ত আপনারা মরবেন না। কিন্তু আপনারা ত যখন তখন মরে যান আর সমস্ত দায়িত্ব স্ত্রীদের উপর পড়ে।' এমতাবস্থায় গ্রামীণ লোকেদের জন্য যেমন কিছু কাজ-কারবার ছেড়ে দিতে হবে, তেমনি মেয়েদের জন্যও কিছু জীবিকার সংস্থান রাখা চাই।

প্রাথমিক বিদ্যালয়ের কাজ নারীদের

আমার বিচারে প্রাথমিক বিদ্যালয়গুলি নারীদের তত্ত্বাবধানে থাকা উচিত। সেখানে ছেলে-মেয়েরা একসঙ্গে লেখাপড়া শিখবে। যদি প্রাথমিক শিক্ষার সমস্ত দায়িত্ব মেয়েদের উপর থাকে তাহলে শিশুদের যথার্থ বিকাশ সম্ভব হবে এবং তারা ঠিক পথে চলবে। এতে সমাজকে নিয়ম-শৃঙ্খলায় রাখার কিছু শক্তিও নারীদের মধ্যে আসবে। নারীদের মধ্যে যদি ততখানি, যোগ্যতা বা শিক্ষা না থেকে থাকে, তবে পঞ্চবার্ষিক যোজনায় তার ব্যবস্থা করে নেওয়া যেতে পারে।

সেনাদল উঠিয়ে দেবার দাবি নারীদের করতে হবে। যতদিন পর্যন্ত দেশরক্ষার কাজ অহিংসাশক্তিতে না হয়ে সেনাশক্তির উপর নির্ভর করবে, ততদিন পর্যন্ত পুরুষের স্থান মুখ্যই থাকবে। দৈহিক গঠন হেতু নারীকে

গর্ভধারণ করতে হয় এবং স্বভাবতই তার পক্ষে হিংসা কঠিন। সুতরাং হিংসাই যদি রক্ষার সাধনরূপে থাকে তবে সমাজজীবনও পুরুষপ্রধানই হবে। এজন্যেই আমার প্রার্থনা, সমাজ-সংরক্ষণের কাজ একমাত্র অহিংসাপদ্ধতিতে করার শক্তি আমাদের হোক। এইকাজে নারীদের শিক্ষিত করে তোলা সহজ।

হীরাপুর (বোম্বাই রাজ্য), ৮. ৭. ৫৮.

সর্বোদয় সমাজরচনা ও নারী

প্রশ্ন করা যায়—'সর্বোদয় সমাজরচনার কাজে মেয়েরা কী সাহায্য করতে পারে?' এ সম্বন্ধে আমার বক্তব্য হচ্ছে, বোনেরা অনেককিছু করতে পারে এবং একাজে তাদের সাহায্যের যথেষ্ট প্রয়োজনও রয়েছে। বর্তমানে সমাজের যে গঠন তা সর্বনাশী এবং পুরুষের বুদ্ধি দিয়ে গড়া। গত পঁচিশ বছরের মধ্যে দুইটি বড়ো-বড়ো বিশ্বযুদ্ধ হয়ে গেল! কাজেই এখন নারীদের এগিয়ে আসতে হবে এবং নিজেদের অধিকার অর্জন করতে হবে। দেশের রক্ষা ও নিয়ন্ত্রণ, এই দুই অধিকারই তাদের গ্রহণ করতে হবে। কারণ পুরুষেরা যেসমাজ গঠন করেছে তার আধার অভয় নয়, ভয়। এরজন্যই দুটি মহাযুদ্ধ হয়ে গেছে এবং তৃতীয় মহাযুদ্ধের ভয় দেখা দিয়েছে।

সর্বনাশ যাতে হয় পুরুষদের বুদ্ধি এখন সেরকম যোজনাই করছে। নারীদের আজ তারমধ্যে পড়ে সমাজের রক্ষা ও নিয়ন্ত্রণের অধিকার নিজেদের হাতে নিতে হবে এবং তবেই সর্বোদয় হবে। এভাবে নারীরা সর্বোদয়ে যে দান করবে তা পুরুষদের দান অপেক্ষা বেশীই হবে। আজ পর্যন্ত পুরুষ ভয়ের আশ্রয়েই সবকিছু রচনা করে এসেছে, অভয়ের আশ্রয়ে নয়। সমাজব্যবস্থার জন্য যে নিয়ম পুরুষ সৃষ্টি করেছে, তা সে নিজেই ভেঙে ফেলছে। সমস্ত দুনিয়ায় কি করে আগুন লাগাতে হয় তা সে জানে। এই অবস্থার পরিবর্তনের জন্য নারীদের এগিয়ে আসা চাই।

নারীরাই সর্বোদয় প্রতিষ্ঠা করতে পারে

প্রার্থনা অন্যের জন্য নয়, নিজেরই চিত্তশুদ্ধির জন্য করতে হবে—এরকম নির্দেশ ভক্তিমার্গে আছে। কিন্তু আমি এই নিয়মের একটু বাইরে এসে প্রভুর কাছে প্রার্থনা করছি—'হে প্রভু, আইক ও ক্রুশ্চেভের মতো লোকদের সদ্‌বুদ্ধি দাও! আমাকে যদি তুমি সদ্‌বুদ্ধি না দাও তবে তাতে দুনিয়ার কিছু আসবে যাবে না। কিন্তু ঐসব লোকের হাতে সারাদুনিয়ায় আগুন লাগাবার শক্তি রয়েছে, তাই তুমি তাঁদের অবশ্যই সদ্‌বুদ্ধি দেবে।' যতদিন যাচ্ছে তত নতুন নতুন ক্ষমতার উৎপত্তি হচ্ছে আর নতুন-নতুন সমস্যা ও ভয় দেখা দিচ্ছে, কিন্তু সমস্যার সমাধান খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে না। এ অবস্থায় সর্বোদয় প্রতিষ্ঠা করতে হলে তা নারীদের দ্বারাই সম্ভব।

সংস্কৃতে ধৃতি, মেধা, ক্ষমা, কীর্তি, বাণী, ভক্তি, মুক্তি ও বুদ্ধি প্রভৃতি শব্দগুলি সবই স্ত্রীলিঙ্গ। 'বোধ' শব্দটি পুংলিঙ্গ, কিন্তু তা বুদ্ধিরই পরিণাম। 'বুদ্ধি' মা আর 'বোধ' তার ছেলে। এজন্যই নারীদের উপর সর্বোদয়সমাজ রচনার আশা করা যায়, কারণ মাতৃশক্তি রক্ষাকর্ত্রী। পুরুষ যখন হিংসাশক্তির আবাহন করে, নারী তখন তাকে রূপ দেয়। 'উত্তর মাং অম্বা মা, পূরব মাং কালী মা।' কালী ও দুর্গার মূর্তিতে সংহারিণী শক্তির কল্পনা রয়েছে। কাজেই এখন সমাজের লাগাম নারীদের ধরতে হবে।

নারীরা যদি ব্যর্থ সমতার কথায় ভুলে ফাঁদে পড়ে, তবে অবস্থা ভয়ংকর আকার ধারণ করবে। 'নারী পুরুষের সমান'—এমন উক্তির মতো অপমান-জনক আর কী উক্তি হতে পারে? আজকাল ত পশ্চিমে মেয়েদের পল্টন পর্যন্ত হয়েছে এবং তারা হাতে বন্দুক নিয়ে যুদ্ধ শিক্ষা করছে। এদেশের মেয়েদের এমন ভ্রমে না পড়া চাই। মনুর সেই কথা মনে রাখতে হবে—'এক হাজার পিতার তুলনায় একজন মাতার সম্মান বেশী।' এখন পুরুষেরা ত নারীদের অত্যাচারের সাধন বানিয়ে রেখেছে। মাতৃত্বের রূপান্তর ব্যভিচারে হয়েছে। এসব হিংসা ও ব্যভিচারের মোকাবিলা করার জন্যে নারীদের

এগিয়ে আসতে হবে। মাতৃত্বের আধার ব্রহ্মচর্য। এজন্য ব্রহ্মচর্য শক্তির বিকাশ নারীদের করতে হবে। তখনই মাতৃত্বের পবিত্রতা সিদ্ধ হবে, সমাজ রক্ষা পাবে এবং সর্বোদয়ও প্রতিষ্ঠিত হবে।

রাজনীতি ও নারী

এ প্রশ্নও উঠতে পারে—'নারীদের রাজনীতিতে অংশ গ্রহণ করা উচিত কি উচিত নয়?' তারা রাজনীতি সম্বন্ধে উদাসীন থাকবে না। তাদের ত রাজনীতিকে ভেঙে দেওয়ার রাজনীতি হাতে তুলে নিতে হবে। লোক-নীতির প্রতিষ্ঠার জন্য আমাদের সমাজে নারীদের এগিয়ে আসা চাই। আমাদের পক্ষমুক্ত সমাজ গড়তে হবে। পুরুষেরা কেউ কংগ্রেস, কেউ পি. এস পি., কেউ কম্যুনিষ্ট পার্টিতে যায় যাবে। কিন্তু মেয়েরা নিশ্চয় করে নেবে যে তাদের পক্ষভুক্ত হওয়ার কোন প্রয়োজন নেই এবং তারা পক্ষমুক্ত থাকবে। মত দেওয়ার অধিকার যা আছে তা ত ঠিকই আছে। ভালো মানুষকে চুপচাপ ভোট দিয়ে তারা তাদের অধিকারকে সার্থক করতে পারে। ভোট দেওয়া ত গুপ্ত গায়ত্রী মন্ত্রের মতো। কাজেই কাকে সমর্থন করা হবে তা কাউকে বলার দরকার নেই। নারীদের কোনও পক্ষভুক্ত হওয়া উচিত নয়। এক হাতে ত্রিশ আর অন্য হাতে সত্তর এরকম কল্পনা মাতৃত্ব বিরুদ্ধ। মাতৃশক্তিতে এমন ভাগাভাগির কথা আসে না, কারণ মা সকলের কল্যাণ দেখেন। এক সময় সংখ্যাগুরুদের উপর সংখ্যালঘুদের রাজত্ব চলছিল। বর্তমানে সংখ্যালঘুদের উপর সংখ্যাগুরুর রাজত্ব চলেছে। এ ত কেবল প্রত্যাঘাতের মতো। কিন্তু সকলের কল্যাণের দিকে নারীদের দৃষ্টি রাখতে হবে।

নারী ও নির্বাচন

ভারতের সংবিধান অনুসারে মহিলারা রাষ্ট্রপতিও হতে পারেন, প্রধান-মন্ত্রীও হতে পারেন। নারীদের জন্য এসব পথ খোলা আছে। কিন্তু

তাঁদের কোনও পদে অধিষ্ঠিত হয়ে পুরুষদের অনুকরণ না করা চাই। পুরুষ পার্টি বানায় আর পরস্পরের মধ্যে বিদ্বেষের সৃষ্টি করে। মেয়েদের পার্টিবানানো উচিত হবে না। মেয়েরা যদি নির্বাচনে দাঁড়াতে চায় তবে তারা কোনো পার্টিভুক্ত না হয়ে জনসাধারণকে সোজা এই কথা বলে দাঁড়াবে—'আমরা নারী, আমরা সকলের সেবা করব। এদিকে দৃষ্টি রেখে আপনারা যদি আমাদের নির্বাচিত করতে চান তবে করুন। আমরা নির্বাচিত হলে নিরপেক্ষভাবে সকলের সেবা করব। কোনও মানুষকে আমরা সে কোন্ পার্টির বা কোন্ জাতির তা বিচার করে দেখব না।'

বাঙ্গালোর, ১৬. ১০. ৫৭.

রাজনীতির সূক্ষ্ম অধ্যয়ন দরকার

আমি ত এই পরামর্শই দেব যে, মেয়েরা যেন রাজনীতি সূক্ষ্মভাবে অধ্যয়ন করে এবং পুরুষদের রাজনীতি থেকে মুক্ত করে দেওয়ার ব্রত নেয়। রাজনীতিতে যা-যা হচ্ছে তা সর্বদা তাদের নিরীক্ষণ করে যেতে হবে। নির্বাচন পুরুষদের হাতে না থাকা উচিত। তা নারীদের হাতে আসা চাই। পুরুষদের টিকি নারীদের হাতে থাকা উচিত। কিন্তু পরিস্থিতি এমন হয়ে গেছে যে পুরুষেরা আজকাল টিকি রাখে না। আর নারীদের চুল বড়ো। ফলে নারীদের টিকিই পুরুষদের হাতে যাওয়ার ভয় রয়েছে। কিন্তু পুরুষদের উপর নারীদের অংকুশ থাকা চাই। নারীরা বলবে, 'সাবধান! হিংসা, দ্বেষ, বৈরিতা এসব ছড়াতে পারবে না।' তারা নিজেরা ত পক্ষমুক্ত থাকবেই পুরুষদেরও পক্ষ থেকে মুক্ত করার চেষ্টা করবে। মেয়েরা যদি আমার এই পরামর্শ অনুযায়ী চলতে পারে, তবে ভারতের ভবিষ্যৎ পরিবেশ নির্মল হয়ে যাবে। কোনও পার্টিভুক্ত হওয়া মেয়েদের পক্ষে শোভাদায়ক নয়। তাদের পক্ষাতীত থাকাই শোভনীয়, কারণ তারা মাতৃশক্তি। যদি দুটি ছেলের মধ্যে ঝগড়া বাধে তবে মা কোন পক্ষ না নিয়ে উভয়কে নিরস্ত করেন।

নারীরা জ্ঞান সাধনা করুন

দ্বিতীয় কথা হচ্ছে, নারীদের গভীরভাবে জ্ঞানাভ্যাস করতে হবে। কস্তুরবা স্মারকের কর্মধারা সম্বন্ধে আমাকে জিজ্ঞেস করা হলে আমি বলেছিলাম তা দুর্বল কর্মধারা। তা বহমানা ঝরণার মতো নয়। এর জল শুকিয়ে যাবে। শিক্ষার অল্পকিছু পুঁজি নিয়ে সেবিকা গ্রামে কাজ করতে আরম্ভ করে। বিয়ে হলে কেউ কাজ ছেড়ে দেয় বা কেউ কাজ করে যেতে থাকে। ছোটো পুঁজি নিয়ে একদিকে যেমন সে তেজস্বী হতে পারে না, অন্যদিকে তেমন পুরুষপ্রধান সমাজে স্বতন্ত্র থেকে কাজ করার শক্তিও তার মধ্যে আসে না। কাজেই নারীদের শক্তি একটুও কম না থাকা চাই। সরস্বতীর মতো জ্ঞানবতী হতে হবে। পুরুষের জ্ঞান কম হলেও চলে, কিন্তু নারীকে সংস্কৃতি রক্ষা করা, প্রকৃতির ঊর্ধ্বে ওঠা প্রভৃতি অনেক কাজ করতে হবে বলে তার পুরা জ্ঞান থাকা প্রয়োজন। যাতে পুরুষ প্রকৃতির উপরে উঠতে পারে সে কাজও নারীকে করতে হবে। পূর্ণ জ্ঞান ছাড়া তা সম্ভব নয়। তার সঙ্গে ভক্তিও চাই। নারীর ভক্তি ও জ্ঞান দুই-ই প্রয়োজন। গভীর জ্ঞানের জন্য তাকে সাধনা করতে হবে। সেইসঙ্গে যখন ভক্তি জুড়ে যাবে তখন সে সমাজকে পথ দেখাতে পারবে এবং সমাজও বিকাশ লাভ করবে।

সরকারী চাকরি ও নারী

একটি প্রশ্ন: 'সরকারী চাকরিতে নারীদের যোগ দেওয়া কি উচিত? এবং সমাজের আর্থিক রচনায় তাদের কী করার আছে?'

এ এক অত্যন্ত দুঃখজনক কাহিনী। যেভাবে যন্ত্র গ্রামশিল্পকে, বিদেশীরা শহরের ব্যবসাকে এবং শহরগুলি গ্রামের শিল্পকে ধ্বংস করার কাজ করছে, সেভাবে পুরুষরাও নারীদের শিল্পকর্ম ব্যবস্থিতরূপে ভেঙ্গে দেওয়ার চেষ্টা করছে। বেদে উল্লেখ আছে যে, কাপড় বোনার কাজ মেয়েরাই করে। বোনার পুংলিঙ্গ প্রয়োগ সংস্কৃতে নেই। 'বস্ত্রাণি পুত্রায় মাতরো বয়ন্তি।'

'বয়ন্তীনাম্' অর্থাৎ তাঁতিনী। নিজের ছেলের জন্যে মা কাপড় বোনে—এর এই অর্থ। কিন্তু পুরুষেরা মেয়েদের হাত থেকে বোনার কাজ নিয়ে নিয়েছে। আসামে যদিও মেয়েরা এখনো বোনার কাজ করে কিন্তু তাও ধীরে-ধীরে পুরুষরা কেড়ে নিতে চাইছে।

আশ্রমের সরঞ্জাম-কার্যালয়ে চরকার বাক্স পালিশ করার কাজ মেয়েরা করত। ছুতার সবই পুরুষ ছিল। আমি জিজ্ঞেস করেছিলাম, 'পুরুষদের দিয়ে এ কাজ করানো হচ্ছে কেন? এ কাজ ত মেয়েদের করা উচিত। কারণ কলা ও সৌন্দর্যের বোধ মেয়েদের সহজাত।' আসলে, মেয়েরা এতে স্বাবলম্বী হয়ে যাবে, তাই এমন কাজ তাদের দেওয়া হবে যাতে তারা পুরুষাবলম্বী থাকে! পুরুষাবলম্বী করার জন্যই যেকাজ মেয়েদের হাতে ছিল তা নিয়ে নেওয়া হয়েছে।

নারীদের হাতে-পায়ে বেড়ি

পুরুষরা আর এক কাজ করেছে। তারা মেয়েদের হাতে-পায়ে বেড়ি লাগিয়ে দিয়েছে। মেয়েদের নাক-কান ফুটো করেছে। পরমেশ্বর যদি তাই চাইতেন, তবে কি মেয়েদের নাক-কান ফুটো করে দিয়েই তাদের পাঠাবার বুদ্ধি তাঁর ছিল না? কিন্তু পুরুষরা বেড়ি লাগাবার কাজ করেছে। বেড়ি সোনার বলে তাকে 'বেড়ি' বলা হয় না। লোহার হলে 'বেড়ি' বলা হত। ফল এই হয়েছে যে মেয়েরা একা বাইরে যেতে পারে না এবং সাহসের কাজ করতে পারে না।

মদালসা (শ্রীমতী মদালসা অগ্রবাল) আমার কাছে পড়ত। সে সময় আশ্রম আর তাদের বাড়ীর মাঝখানে একটা জঙ্গল ছিল। মদালসা সকালে স্নান করে আসত। আশ্রম ছিল নলবাড়ীতে। ও পাঁচটার সময় লণ্ঠন জ্বালিয়ে আসত। ওর মার ভয় হত—মেয়ে একলা যায় বিপদ হতে পারে, কারণ একে মেয়ে তার উপর একেবারে নির্জন পথ! মেয়েরা

যে নির্ভয়ে একা কোথাও যেতে পারে এ যেন কল্পনাও করা যায় না। রাতে বা ভোরে তাদের কোথাও একা পাঠানো বিপজ্জনক বলে মনে করা হয়, কারণ মেয়েদের গায়ে গয়না থাকে। গয়না অমূল্য, তাই মেয়েরাও ভয় পায়। পুরুষরা মেয়েদের এভাবে নিজেদের ব্যাঙ্ক বানিয়ে নিয়েছে। কবিরাও এর গৌরব করেন। 'নারীরা ভীরু'—এরকম তাঁরা গৌরবার্থে লেখেন। কিন্তু নারীদের কাছে এ ধরনের বিশেষণ গৌরবজনক হতে পারে না। এতে ত তাদের অপমান বোধ করা উচিত।

গাঁয়ের শক্তিময়ী মহিলা

সংস্কৃতে নারীদের অনেক মহিমা কীর্তিত হয়েছে। তাদের 'মহিলা' বলা হয়। মহিলা মানে মহতী, সামর্থ্যবতী, শক্তিরূপিণী। সাধারণত পুরুষদের অপেক্ষা নারীরা বেশী সূক্ষ্মবুদ্ধির অধিকারিণী। তারা ক্ষুধার্থকে খাদ্য দেয়, তৃষ্ণার্তকে জল দেয় এবং আহতের সেবা-যত্ন করে। নিঃসন্দেহে নারীরা পুরুষ অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ। তাদের কাছে সূক্ষ্মশক্তি আছে বলে তারা মহাশক্তি হতে পারে। বেদে এর উল্লেখ আছে। সুতরাং পুরুষদের খোসামোদ করা তাদের উচিত নয়। পুরুষরা মেয়েদের কাজ কেড়ে নিয়ে আবার তাদের সুবিধা দেওয়ার কথা বলছে। অর্থাৎ মেয়েদের তারা হাতের পুতুল বানিয়ে নিয়েছে। মেয়েদের মধ্যে আবার যারা যত শিক্ষিত তারা তত পরাধীন। আমি গ্রামে এমন সব মেয়েও দেখেছি যারা দোষ হলে স্বামীদের গালে চড় মেরে দেয় এবং স্বামীরা চুপ করে থাকে। গ্রামের মেয়েরা অশিক্ষিত হতে পারে কিন্তু তারা কাজ করে, পরিশ্রম করে। গ্রামে আমি এমনও সাধ্বী স্ত্রী দেখেছি যে মজুরের কাজ করে এবং স্বামীর উপর যথেষ্ট প্রভাব রাখে। শিক্ষিত স্ত্রীরা আরামপ্রিয় হয়। তারা রান্না ও ছেলেপুলে রাখার জন্যে চাকর রাখে। তাদের চোখ এত কোমল হয়ে যায় যে ধোঁয়া পর্যন্ত সহ্য করতে পারে না।

মার হাতের রান্না

ভগবান শ্রীকৃষ্ণ যখন গুরুগৃহে গেলেন, তখন গুরু আশ্চর্যান্বিত হলেন— 'যিনি সারা সমাজের উদ্ধারকর্তা হবেন, তাঁকে আমি কি শেখাব!' তবু ছ মাস পড়ার নাটক চলল। বিদায় নেওয়ার সময় কৃষ্ণ গুরুর সেবা করলেন। গুরু বললেন, 'এখন তুই বর চা।' কৃষ্ণ তখন বর চাইলেন, 'আমার সারাজীবন যেন **মাতৃহস্তেন ভোজনম্** মিলে।' কথিত আছে, কৃষ্ণ জীবনভর মার হাতের রান্না খেতে পেয়েছিলেন।

নিজের হাতে রান্না করে ছেলেদের খাওয়াবার চেয়ে বেশী বশীকরণ-শক্তি আর কিসে থাকতে পারে? গান্ধীজীও আশ্রমে আমাদের খাবার পরিবেশন করতেন। এর চেয়ে বেশী সেবা অন্য কিছুতে হতে পারে না। মাতৃ-বাৎসল্যের মূল্য অনেক। আমার কাছে রান্নার মূল্য খুব এবং একে আমি 'ফাইন আর্ট' বলি। সঙ্গীত, চিত্রকলা, নৃত্য প্রভৃতির মতো রান্নাও ললিতকলা। এই কলা মেয়েদের এক বড়ো শক্তি। কিন্তু আজকাল ত হোটেল খোলা হচ্ছে আর ধীরে-ধীরে সেই কলাও মেয়েদের হাত থেকে চলে যাচ্ছে। মেয়েদের টক্-টক্ টাইপিস্টের কাজ, যান্ত্রিক কাজ দেওয়া হয়। বলা হয়ে থাকে, আঙ্গুল দ্রুত চলে বলেই মেয়েদের এ কাজ দিয়ে অপিসে বসানো হচ্ছে। আমি এ কথা বলি না যে, মেয়েদের এ কাজ করা উচিত নয়। আমার বক্তব্য হচ্ছে, মেয়েরা এমন কাজ করবে যাতে নারীশক্তির বিকাশ হয় এবং শান্তি রক্ষা পায়। যেকাজে পবিত্রতা ও শান্তি বজায় থাকে সে কাজে নারীদের আগ্রহ থাকা চাই। ছেলে-মেয়েদের সহশিক্ষার ভার মায়েদের নিতে হবে। যদি বুনিয়াদী শিক্ষার দায়িত্ব নারীদের হাতে থাকে তবে শৈশব অবস্থা থেকেই শিক্ষার্থীদের উপর ভালো সংস্কার পড়বে এবং সমাজেরও উদ্ধার হবে।

নারী ও শান্তির কাজ

আমি ত এই আশা করি, ঘরে-ঘরে নারীরা এই প্রতিজ্ঞা করবে যে, তারা কখনো সমাজে অশান্তি হতে দেবে না এবং অশান্তির কোনো কাজে অংশ গ্রহণ করবে না। এই প্রতিজ্ঞার চিহ্নস্বরূপ নারীরা নিজ-নিজ ঘরে সর্বোদয়-পাত্র স্থাপন করুন। 'সমাজকে আমরা শান্তির পথে এগিয়ে নিয়ে যাব'—নারীদের এই প্রতিজ্ঞা করা চাই। সারা দেশে শান্তিসেনার কাজ করার জন্য তাদের এগিয়ে আসতে হবে। তাদের রাজনীতি থেকে মুক্ত থাকতে হবে এবং নিষ্পক্ষ, নির্বৈর ও নির্ভীক হতে হবে। এরজন্য নারীদের গভীর অধ্যয়ন এবং সর্বোদয়বিচারকে সর্বাঙ্গীন বিচার করে তুলতে হবে। তাদের কাছে এ আমার আন্তরিক প্রার্থনা। আমি চাই, সর্বোদয়সমাজ প্রতিষ্ঠার কাজে নারীদেরই যেন প্রাধান্য থাকে।

সোখড়া (বড়োদা), ২৮. ১০. ৫৮.

নারী ও সেবা

নারীরা সাহিত্যসৃষ্টির মধ্য দিয়েও রচনাত্মক কার্যে প্রত্যক্ষভাবে অংশ-গ্রহণ করতে পারে। এর অর্থ এই যে তারা যেমন বাল্মীকি হতে পারে তেমনি রামচন্দ্রের সৈনিকদলভুক্তও হতে পারে। শহরে কত নারী দুঃখী, রোগী ও বেকার হয়ে আছে। তাদের সকলের কাছে যেতে হবে এবং সেবা করতে হবে। আমার মনে আছে, যখনই কোন বাড়ীতে রান্না করার অসুবিধা দেখা দিত আমার মা নিজে সেখানে যেতেন এবং রান্না করে দিয়ে আসতেন। নিজের ঘরের রান্না আগে শেষ করে নিতেন। জিজ্ঞেস করতাম, 'এত স্বার্থবুদ্ধি কেন? আগে আমাদের জন্য রান্না করে পরে ওঁদের রান্না করতে যাচ্ছ?' মা বলতেন, 'এ স্বার্থ নয় পরমার্থই। ওঁদের রান্না আগে করে দিয়ে এসে তোমাদের রান্না করলে তোমরা গরমই খেতে পারতে,

কিন্তু ওঁদের খাবার যেত একেবারে ঠাণ্ডা হয়ে।' আরও একটি কাজ মেয়েরা করতে পারে। তারা যদি একটি করে হরিজন বালকের লালন-পালনের ভার নেয় এবং নিজের ছেলের মতো শৈশব থেকে তাকে মানুষ করে তোলে, তবে তা হবে একটি হরিজন ছাত্রাবাস পরিচালনার চেয়েও বেশী মহত্ত্বপূর্ণ ও বৈপ্লবিক কাজ। তাছাড়া চরকা ও চাকীর দ্বারা তারা বাড়ীতে গ্রামোদ্যোগ ও শ্রমনিষ্ঠার পরিবেশ সৃষ্টি করতে পারে। এতে তাদের প্রতিভা বিকাশেরও যথেষ্ট সুযোগ হবে।

পরিশ্রমের দৃষ্টি

রুটি বানাবার কাজ মা করেন আর আমরা তাঁর নাম করি। মার আসল মাতৃত্ব ঐ রান্নার মধ্যেই আছে। ভালো-ভালো খাবার তৈরি করে বাচ্চাদের খাওয়ানোর মধ্যে কতই-না জ্ঞান ও প্রেমভাব ভরা রয়েছে! মায়েদের হাত থেকে যদি রান্নার কাজ নিয়ে নেওয়া হয়, তবে তাঁদের প্রেমের সাধনটিই হাতছাড়া হয়ে যাবে। প্রেমভাব প্রকাশের এ সুযোগ কোন মা-ই ছেড়ে দিতে রাজী হবেন না। এর সাহায্যেই ত তাঁরা বেঁচে থাকেন। কেউ যেন মনে না করেন যে আমি কোন ছলে রান্নার বোঝা নারীদের ঘাড়ে চাপিয়ে দিতে চাইছি। আমি ত তাদের বোঝা হালকা করে দিতে চাই। এরজন্যই আশ্রমে রান্নার কাজ প্রধানত পুরুষরাই করে। আমার বক্তব্য এইমাত্র যে মা রান্নার কাজ ছেড়ে দিলে যেমন তাঁর জ্ঞানের সাধন ও প্রেমের সাধন চলে যাবে, তেমনি আমরা যদি পরিশ্রমকে ঘৃণা করি তবে আমরাও জ্ঞান-সাধন হারিয়ে ফেলব।

হাত-পেষাইর গুরুত্ব

এক গ্রামের কথা বলছি। সেখানে একজন মুসলমান বাস করত। তার স্ত্রী অসুস্থ হয়ে পড়েন। মুসলমানটির আমার উপর শ্রদ্ধা ছিল। সে আমাকে ডেকে নিয়ে গেল এবং চিকিৎসা সম্বন্ধে আমার পরামর্শ চাইল। আমি

দেখলাম বোনটির অজীর্ণতা ছাড়া অন্য কোন উপসর্গ নেই। আমি জিজ্ঞেস করলাম—'ঘরে কিসের আটা আনা হয়ে থাকে?' বলা হল যে তা মিলের আটা। পরামর্শ দিলাম, ঘরে একটি জাঁতা এনে খুব ভোরে উঠে কিছু কিছু গম ভাঙ্গতে আর তা থেকে যে আটা হবে তার রুটি খেতে। এতে সমস্ত রোগ দূর হয়ে যাবে এবং ক্ষুধা দ্বিগুণ বাড়বে। বোনটি জাঁতার সাহায্যে ধীরে-ধীরে গম ভাঙ্গতে আরম্ভ করলেন। পনের-কুড়ি দিন পরে বোনটিকে দেখতে গেলাম এবং জিজ্ঞেস করলাম—'এখন শরীর কেমন আছে?' তিনি উত্তর দিলেন—'ভালো আছি। হাতে প্রস্তুত আটার রুটি যেদিন থেকে খাওয়া শুরু করেছি তারপর থেকেই খিদে বেড়েছে। হাতের রুটি খেতেও ভালো লাগে।' আটা পিষতে গিয়ে ব্যায়াম হয় এবং তাতে শরীর ভালো থাকে। এতে মেয়েদের শরীরের শক্তি বজায় থাকে।

কিন্তু কেবল নারীরাই কেন আটা পেষার কাজ করবে? পুরুষদেরও একাজ কিছু করা উচিত। জেলে পুরুষরা যে গম পেষে এ ত সকলেই জানে। পরমধাম আশ্রমেও প্রতিদিন আমরা তা করি। নারী-পুরুষ উভয়েই একাজ করে। হাতে পেষা খাঁটি আটায় যে খাদ্যপ্রাণ থাকে মিলের জিনিসে তা থাকে না। আলস্য পরিহার করে পরমেশ্বরের নাম স্মরণ করতে করতে জাঁতা চালিয়ে যাও। কবীর এক দোঁহায় লিখেছেন যে, মন্দিরে পাথর বসিয়ে মানুষ তার অর্চনা করে। যে চাকীর সাহায্যে আমরা আটা পিষি আর প্রতিদিনের রুটি প্রস্তুত করি সেই চাকীর পূজা কেন করব না? এও ত পরমেশ্বর। বিল্ব-পুষ্পদলে চাকীর পূজা হয় না। প্রতিদিন পরিষ্কার করে তাতে তেল লাগিয়ে আটা পেষাতেই চাকীর পূজা।

যুগের দাবি

এ শহরের নাম পাতিয়ালা। এখানে অনেক লেখাপড়া জানা বোনের বাস। আমি আশা করি, তাঁরা সর্বোদয়-পাত্রের কাজকে সার্থক করে তুলবেন। গান্ধীজী লোকসেবক-সংঘ প্রতিষ্ঠা করার কথা বলেছিলেন। সেই লোকসেবক-সংঘ মেয়েরা গড়ে তুলুন।

লোকসেবক-সংঘ

আজকাল এক নতুন পদ্ধতির আবির্ভাব হয়েছে। পুরুষেরা সব পার্টিতে জড়িয়ে যাচ্ছে। নির্বাচন যদি কুস্তি খেলার মতো কিছু হত, তবে এ ঠিকই ছিল। হওয়া ত উচিত, দুই ভাই একই ঘরে থাকবে এবং প্রেমের সঙ্গে বসবাস করবে। দুজনের রাজনৈতিক বিচার যদি আলাদা-আলাদা হয়, তবে তারা জনসাধারণকে নিজ-নিজ বিচার বুঝিয়ে ভোট চাইবে। নির্বাচনে একজন হেরে যাবে অন্যজন জয়ী হবে, তাহলেও তারা প্রেমের সঙ্গে বাস করবে। এসব হলে তবেই না ভারতের বৈশিষ্ট্য বজায় থাকবে। নয় ত পশ্চিমী ঢং-এ যে-নির্বাচন যুদ্ধ হয় তাতে গ্রামে-গ্রামে আগুন লেগে যায়। সুতরাং বোনেদের লোকসেবক-সংঘ প্রতিষ্ঠা করার জন্যে এগিয়ে আসতে হবে এবং পুরুষদের বলতে হবে—'তোমাদের ঝগড়া নিয়ে তোমরা থাক! আমরা তার মধ্যে নেই। তোমরা সন্তান আর আমরা মা, কোনো পক্ষে আমরা থাকব না। আমরা হৃদয় জুড়ে দেওয়ার কাজ করব।' আমি বলি, যত পুরুষ আছে তারা সব আলাদা-আলাদা পার্টিতে চলে যাক আর মেয়েরা সবাই আমার দিকে আসুক, তখন দেখা যাবে ভারতের চেহারা কী দাঁড়ায়।

গান্ধীজীর অটুট শ্রদ্ধা

এরকম এক লোকসেবক-সংঘ গড়বার প্রেরণা বোনেদের হোক। আমি আশা করি বোনেরা একাজ অবশ্যই করবেন। বোনেদের উপর গান্ধীজীর অগাধ

শ্রদ্ধা ছিল। তাঁরা যাতে এগিয়ে আসেন তারজন্য গান্ধীজীর চেষ্টার অবধি ছিল না। দয়ানন্দও চেষ্টা করেছিলেন। তিনি মেয়েদের বেদ অধ্যয়ন করতে বলেছিলেন এবং তারজন্য চেষ্টাও করেছিলেন। গান্ধীজীর প্রচেষ্টায় হাজার-হাজার বোন সার্বজনীন কাজে এগিয়ে এসেছেন এবং তাঁরা অনেক বড়ো-বড়ো কাজ করেছেন। অনেকে গান্ধীজীর সঙ্গে কাজ করেছেন। তাঁদের অন্তরও গান্ধীজীর জন্য খোলা ছিল। কাজেই বোনেরা যদি এ কাজ করতে পারেন, তবে গান্ধীজীর আত্মা শান্তি পাবে।

মদের দোকানে পিকেটিং করার জন্য কাদের পাঠানো যায় এই প্রশ্ন গান্ধীজীর সময় উঠেছিল। গান্ধীজী সেখানে বোনেদের পাঠাতে বললেন। এই অদ্ভুত কথা শুনে সকলে খুব অবাক হয়ে গেল। তারা বলতে আরম্ভ করল, 'বদমাশদের আড্ডাখানায় বোনেদের কী করে পাঠানো যায়?' বাপু বললেন, 'অন্ধকারের মধ্যে আলোর প্রকাশ হলে তবেই না কাজ হবে। বোনেরা সেখানে গেলে ঐসব লোক লজ্জা পাবে। আমাদের মধ্যে সর্বাপেক্ষা সজ্জন কারা?—বোনেরা।' লোকেরাও দেখল যে, বোনেরা যেখানে-যেখানে গেলেন সেখানেই ভালো কাজ হল। গান্ধীজীর এই অন্তর্দৃষ্টি ছিল। দাঙ্গা-হাঙ্গামা বন্ধ করার কাজ বোনেরা খুব ভালোভাবে করতে পারেন। যেখানে ঝগড়া হয় সেখানে যদি শান্তির প্রতিমূর্তি (নারী) উপস্থিত হন, তবে ঝগড়া সঙ্গে সঙ্গে বন্ধ হয়ে যাবে। তাই আমি বিশ্বাস করি যে, শান্তিসেনার কাজ বোনেরা খুব ভালোভাবে করতে পারবেন।

সর্বোদয়-পাত্র ও বোনেরা

সর্বোদয়-পাত্রের কাজ বোনেরা এখনই আরম্ভ করতে পারেন। এক মুঠো চাল নিজের ছোটো ছেলের হাত দিয়ে প্রতিদিন সর্বোদয়-পাত্রে রাখতে হবে, আর তাই হবে সর্বোদয়ের ভোট। এভাবে প্রত্যেক ঘরে সর্বোদয়-পাত্র রাখলে এক শক্তির সৃষ্টি হবে। বোনেদের একথা বলতে হবে। প্রত্যেক বাড়ীতে গিয়ে

বুঝাতে হবে– 'শান্তির জন্য সর্বোদয়-পাত্র রাখা দরকার। পক্ষমুক্ত হয়ে লোকসেবক-সংঘ গড়তে হবে এবং সকলের সেবা সমান ভাবে করতে হবে। মনে কখনও কোন ভেদভাব থাকবে না। মানুষের সেবা মানুষের মতো করতে হবে। যেখানে যা খারাপ আছে তার বিরুদ্ধে আওয়াজ তুলতে হবে।' এরকম সিদ্ধান্ত বোনেরা গ্রহণ করতে পারেন। পাতিয়ালার বোনেরা ইচ্ছা করলে এমন শান্তির শক্তি সৃষ্টি করতে পারেন যা সারা পাঞ্জাবকে বাঁচাবে।

পাতিয়ালা,
২৫ ৪. ৫৯.

শান্তিসেনার কাজ

ভূদানযজ্ঞ-আরোহণের কাজে মেয়েরা যেভাবে অংশ গ্রহণ করেছে তাতে আমি অবাক হয়েছি। নিজেদের অধ্যয়ন, চাকরি ইত্যাদি সবকিছু ছেড়ে দিয়ে বোনেরা এ কাজে লেগে গেছে। তারা সংখ্যায় অল্প, কিন্তু কাজ করেছে অনেক। বর্তমানে ভারতে যেভাবে সার্বজনিক মঙ্গলের চিন্তা করা হয়ে থাকে, সে ভাব পাল্টানো ছাড়া ভারত তার নিজের স্বরূপ দেখতে পাবে না। জীবনে রাজনীতির একটি স্থান অবশ্য আছে এবং তা বিশেষ স্থান। তাহলেও যেভাবে আজ রাজনীতিকে ভারতের খবরের কাগজগুলি ও শিক্ষিত লোকেরা সর্বস্ব করে তুলেছেন, তাতে ভারতের উত্থান হতে পারে না। বরং আজকাল লোকতন্ত্রের অর্থ ই মাৎসর্য হয়ে দাঁড়িয়েছে। যদিও রাজনীতির নিজস্ব গুরুত্ব আছে, তাহলেও তার থেকে আরো অনেক বেশী গুরুত্বপূর্ণ জিনিস রয়েছে যে-সম্বন্ধে এই দেশের জ্ঞান হওয়া দরকার।

নারীরা বিদ্রোহ করুন

ভূদানের ইতিহাস পর্যালোচনা করলে দেখা যায় যে কীভাবে কোরাপুটের জঙ্গলে-জঙ্গলে ঘুরে যাদের খোঁজ কেউ রাখে না তাদের জাগিয়েছে মেয়েরা। কিন্তু দেশ এসবের কোন খবরই জানে না। এই আরোহণের

কাজে মেয়েরা যে কাজ করেছে তার স্বতন্ত্র ইতিহাস থাকবে। মীরাবাঈ-এর এক পদ আছে :

মাতু ছাঁড়ি, পিতা ছাঁড়ি, ছাঁড়ি সগা সোঈ।
আঁসুবন জল সীঁচ-সীঁচ প্রেম-বেলী বোঈ॥

ঠিক এমনিভাবে কত বোন নিজেদের সর্বস্ব ছেড়ে এই কাজ করেছে। আধ্যাত্মিক অধিকার সম্বন্ধে বোনেদের ভালোভাবে ভাবতে হবে এবং পুরুষপ্রধান এই দুনিয়ার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা করে নিজেদের প্রতিষ্ঠিত করতে হবে। এছাড়া বর্তমানে যে-ত্রুটিপূর্ণ মূল্য প্রচলিত আছে তার পরিবর্তন হবে না।

পুরুষদের উপর অংকুশ

এক সময় ছিল যখন নারীদের স্থান ঘরে বলে মনে করা হত। আজও ঘর তাদের হাতেই থাকবে। কিন্তু গত পঁচিশ বছরে পুরুষেরা এমন ব্যবস্থা করেছে যে দুনিয়া পুরাপুরি হয়রানি ও অসন্তোষে ভরে গেছে। এই ব্যবস্থার ফলস্বরূপ দুইটি বিশ্বযুদ্ধ হয়ে গেছে এবং তৃতীয় মহাযুদ্ধ কবে বেঁধে যাবে তা বলা যায় না। নারী-পুরুষ সমান এইকথা বলে লোকেরা মেয়েদের হাতেও বন্দুক দিতে চাইছে এবং তাদের দিয়ে পল্টন তৈরি করতে চাইছে। হওয়া ত উচিত মেয়েদের হাতে এমন নিয়ন্ত্রণশক্তি থাকা যাতে পুরুষদের এইকাজ থেকে তারা নিবৃত্ত করতে পারে এবং নিজেদের জীবনে মাতৃশক্তির বিকাশ সাধন করতে পারে। তা না করে সেনাদলে তাদের ভর্তি হওয়ার সুযোগ দেওয়া হয়েছে এবং তাতে তাদের সাহায্য আশা করা হচ্ছে। দুনিয়ায় এসব নির্ভীকতার নামে করা হচ্ছে এবং মেয়েরাও হয়ত মনে করছে যে যদি তাদের হাতে বন্দুক এসে যায় তবে তারা নির্ভীক হয়ে যাবে। কিন্তু বন্দুকের সঙ্গে নির্ভয়তার কোন সম্বন্ধ নেই। বন্দুক থাকলেই যদি নির্ভীক হওয়া যেত তাহলে আমেরিকা ও রাশিয়ার লোকেরা সব নির্ভীক হয়ে যেত। তাদের এত অস্ত্র-শস্ত্র তবু তাদের হৃদয়ে ভয় বাসা বেঁধে আছে। আমেরিকা ও

রাশিয়া একে অন্যকে ভয় করে। এসবই পুরুষদের ব্যবস্থাপনায় হয়েছে। কাজেই এখন মেয়েদের সামাজিক দায়িত্ব গ্রহণ করার সময় এসেছে এবং পুরুষদের উপর তাদের অংকুশ রাখতে হবে। ভারতের নারীজাতির কাছে আমার এই আশা।

করুণার রাজ্য

আমি চাই ভারতের নারীরা আত্মশক্তির উপর বিশ্বাস রেখে এগিয়ে আসুন। ভবিষ্যতে তাঁদের হাতেই সমাজনিয়ন্ত্রণের দায়িত্ব পড়বে, তারজন্য মেয়েদের প্রস্তুত হতে হবে। তাঁরা যদি শান্তিসেনার কাজকে তুলে নেন তবে দুনিয়া বদলে যাবে এবং যেসব সমস্যা দেখা দিয়েছে তা থেকে মুক্তি পাবে। পুরুষদের দিয়ে এসব হবে না। এখন তাদের বুদ্ধি প্রকৃতিস্থ অবস্থায় নেই। কোনকিছু খেয়ালই করে না, আর যদি খেয়াল করে তবে বলে—সৈন্য বাড়াও। এই বিজ্ঞানের যুগে পুরুষদের বুদ্ধি যখন কাজ করছে না, তখন নারীরা যদি তাঁদের দেবীশক্তি নিয়ে, সংযমশীলতা নিয়ে, মাতৃত্ব নিয়ে এগিয়ে আসেন তবে করুণার রাজ্য প্রতিষ্ঠা করতে পারেন।

ভক্তি, মুক্তি ও শান্তি

আমি চাই শান্তিসেনার দায়িত্বও তাঁরা হাতে নিন। শান্তি শব্দ স্ত্রীলিঙ্গ। ভক্তি, মুক্তি, শান্তি প্রভৃতি সমস্ত শব্দই স্ত্রীলিঙ্গ। ভগবান গীতায় বলেছেন 'কীর্তিঃ শ্রীবাক্ চ নারীণাং স্মৃতির্মেধা ধৃতিঃ ক্ষমা।' নারীদের মধ্যে কীর্তি, লক্ষ্মী, বাণী, স্মৃতি, বুদ্ধি, ধৈর্য ও ক্ষমা আছে—একথা ভগবান নিজে বলেছেন। এসব গুণ একত্র করে নারীদের মধ্যে ভগবান নিজের বিভূতি প্রকাশ করেছেন। আমার খুব দুঃখ যে ভারতে যেসব মেয়েরা স্কুল-কলেজে পড়ে তাদের এবিষয়ে জ্ঞানই নেই। কিন্তু আমি চাই তারা এসব বুঝুক।

শান্তিসৈনিকদের পক্ষমুক্ত হতে হবে। আমাদের অনেক বন্ধু আজ রাজনৈতিক পক্ষভুক্ত হয়ে আছেন। আমি বলি যে তাঁদের যদি একান্তই ভালো লাগে তবে

তাঁরা পক্ষগ্রস্ত থাকুন, কিন্তু তাঁদের স্ত্রীদের পক্ষমুক্ত করে দিন। নারীদের শান্তি-সেনায় অবশ্য যোগ দেওয়া চাই।

পন্ঢরপুর,
৩১. ৫. ৫৮.

নারী ও পুরুষদের লজ্জা

আমাদের সমাজরচনায় প্রথম থেকেই নারীদের জন্য বাঁদিক আর পুরুষদের জন্য ডানদিক রাখা হয়েছিল। আজ তা একেবারে উল্টে গেছে। মেয়েরা পিছিয়ে গেছে এবং পুরুষেরা এগিয়ে গেছে। যদি ঠিকভাবে চিন্তা করা হয় তবে দেখা যাবে যে, বর্তমানে নারীদেরই সমাজের ভার নেওয়া উচিত। তাদের বামপন্থী হয়ে সমাজকে এগিয়ে নিয়ে যেতে হবে।

ক্রান্তিকে রূপ দিন

সমাজক্রান্তিকে কে রূপ দেবে এই প্রশ্ন যখনই উঠেছে তখনই মনে হয়েছে যে মেয়েরাই পুরুষদের দু'কদম পেছনে ফেলে এই কাজ করতে পারে। মেয়েদের হাতে এই কাজ কী করে সঁপে দেওয়া যায় তাই আমি ভাবছিলাম। এর জন্য আমি অহিংসা শক্তির খোঁজে ছিলাম। কোনও আক্রমণের প্রয়োজন না রেখে কেবল অহিংসার দ্বারাই যাতে সমাজের সমস্ত কাজ হয়ে যায় সেই চিন্তাই করছিলাম। যদি তা সম্ভব করতে হয় তবে নারীদেরই সে-সুযোগ দিতে হবে, এমন মনে হচ্ছিল। শেষে লোকসম্মতির জন্য 'সর্বোদয়-পাত্রে'র কথা মনে এল এবং দেখা গেল যে নারীশক্তিকে এই কাজে লাগানো যেতে পারে। পুরুষদের বুদ্ধি ত রাজনীতির পাথরে ভরা রয়েছে। সেগুলি বেরিয়ে না যাওয়া পর্যন্ত পুরুষদের দিয়ে কোন কাজ হবে না। এরজন্য এইকাজে মেয়েদেরই এগিয়ে আসতে হবে। তাদের মাথায় রাজনীতি না থাকায় নারীসমাজে কখনো বিভেদের সৃষ্টি হবে না। তাদের মধ্যে ধর্মবুদ্ধি প্রবল। লোকমান্য তিলক সর্বদা বলতেন যে, ভারতে যদি কেউ ধর্মকে

বাঁচিয়ে রেখে থাকে তবে মেয়েরাই তা রেখেছে। এই দুটি গুণ মেয়েদের মধ্যে থাকার দরুন তারাই একাজের যোগ্য। যদি তাদের শক্তি এই কাজে পাওয়া যায় তবে অনেক বড়ো ক্রান্তি হতে পারে।

প্রেরণার আবশ্যকতা

মনুষ্যজাতির শরীরে তমোগুণ থাকার জন্য মধ্যে মধ্যে তাদের পরিচালনা করার ও প্রেরণা দেওয়ার প্রয়োজন দেখা দেয়। আজকাল তমোগুণে জড় পাথরের মতো হয়ে আছে এমন কত অহল্যা সমাজে পড়ে আছে। তাদের যদি একবার প্রেরণা দেওয়া যায় তবে তৎক্ষণাৎ তারা কাজে লেগে যাবে। ঘড়িকেও চব্বিশ ঘণ্টার মধ্যে একবার চাবি দিতে হয়। সুতরাং মাঝে মাঝে প্রেরণা দিতেই হবে। তাহলেও সমাজ নারীদের হাতেই সুরক্ষিত থাকবে। একবার কোন ভালো কাজ হাতে দিলে তারা কখনো তা ছাড়ে না। পুরুষেরা কিন্তু ছেড়ে দেয়। ধর্মবুদ্ধি জাগ্রত থাকে বলেই নারীদের হাতে এইকাজ সঁপে দিলে কোন ক্ষতি হওয়ার সম্ভাবনা নেই।

এ সৌম্যতম সত্যাগ্রহ

সর্বোদয়-পাত্রের দ্বারা মেয়েদের এগিয়ে আসার চমৎকার সুযোগ হয়েছে। কাজ শুরু করে দিলে কিছু-কিছু বাস্তব অসুবিধারও সম্মুখীন হয়ত হতে হবে। সর্বোদয় পাত্রে দেওয়া শস্যাদি বাড়ি-বাড়ি থেকে নিয়ে যাওয়ার জন্য সেবক তৈরি করে নিতে হবে, যাদের খাওয়া-থাকার খরচ নির্বাহিত হবে ঐ সংগৃহীত শস্যাদি থেকে। মেয়েরাই-বা 'সেবক' হয়ে কেন এগিয়ে আসবে না? যদি বানপ্রস্থী মেয়েরা এইকাজে এগিয়ে আসেন, তবে আমাদের খুব ভালো সেনাদল সৃষ্টি হয়ে যাবে। আমি পুরুষদের বলব, আপনারা আপনাদের রাজনীতি নিয়ে থাকুন; আপনাদের স্ত্রীদের আমার হাতে ছেড়ে দিন। তখন আপনাদের রান্না-খাওয়াও আমার সঙ্গে এসে যাবে।'

তাৎপর্য, নারীশক্তি যদি রাষ্ট্রকার্যে অংশ গ্রহণ করে, তবে নিশ্চয়ই

রাষ্ট্রের উন্নতি হবে। বর্তমানে পুরুষদের কাছে কোন বুদ্ধিই অবশিষ্ট নেই। তাদের বুদ্ধিভ্রম হয়ে গেছে। 'যেমন খুশী তেমন' করতে-করতে আজ তারা 'এটম্' ও 'হাইড্রোজেন' বোমা পর্যন্ত পৌঁছে গেছে। তাই তাদের বুদ্ধি আর এগোয় না। পুরুষদের বস্ত্রহরণ আরম্ভ হয়ে গেছে। তাদের লজ্জা নিবারণের জন্য নারীশক্তিকে এগিয়ে আসতে হবে।

রাজুরী (বোম্বাই-রাজ্য),
৬ ৭. ৫৮

বোনেদের জন্য আহ্বান

শান্তিসেনা সকল বোনেদের জন্যই উপযোগী। পল্টনে বোনদের দিয়ে কী কাজ করা যেতে পারে? তাদের হৃদয়ে দয়াভাব প্রধান। কাজেই তারা ভাববে, 'এই নিষ্ঠুর হত্যাকার্যে আমরা কী করব?' কিন্তু শান্তিসেনায় বোনেরা ভাইদের অপেক্ষা বেশী কাজ করতে পারে। এর জন্য আমি পাঞ্জাব সর্বোদয়-মণ্ডলের অধীনে এক 'মহিলা শান্তিসেনা মণ্ডল' গঠন করেছি। পুরা সময় না দিতে পারার জন্য যারা শান্তিসৈনিক হতে পারবে না তারা 'শান্তি-সহায়ক' হতে পারবে এবং কোনো অশান্তি হওয়ার সম্ভাবনা থাকলে সেখানে গিয়ে তা মিটিয়ে দেবার কাজ করতে পারবে। সুতরাং শান্তিসেনার কাজে যোগদান করার জন্য আমি প্রধানত বোনেদের আহ্বান করেছি। বারাণসীতে শান্তিসেনার দপ্তরও এক বোন পরিচালনা করছে। এভাবে বোনেরা এগিয়ে এলে শান্তিসেনার কাজ তাড়াতাড়ি হবে।

গান্ধীজীর উত্তরাধিকার হিসেবে কংগ্রেসকে তিনি লোকসেবক-সংঘে পরিণত করার নির্দেশ দিয়েছিলেন। কিন্তু কংগ্রেসসেবীরা লোকসেবক হতে পারেননি, কারণ তাঁরা তখন রাজনীতি নিয়ে ব্যস্ত ছিলেন। গান্ধীজী বুঝে নিয়েছিলেন যে রাজনীতির দিন চলে গেছে এবং তা এখন পুরানো যুগের ব্যাপার। এর জন্যই ১৯৪৭ সালের ১৫ই আগষ্ট দিল্লীতে যখন বিরাট সমারোহ চলছিল, গান্ধীজী তখন অন্যত্র ঘুরছিলেন। তিনি বুঝতে পেরেছিলেন

যে এই অণুযুগে রাজনীতির প্রয়োজন মিটে গেছে। আজ যদি তিনি থাকতেন তবে যেকাজ আমি করছি সেই কাজই অনেক বিরাট আকারে করতেন। তিনি যে লোকেই থাকুন না কেন সেখান থেকে আমাকে আশীর্বাদ করে বলছেন—'আমার ছেলে আমার কাজ করে যাচ্ছে।'

মহিলাদের উপর তাঁর অনেক আশা ছিল। ভগবান শ্রীকৃষ্ণের পর মহিলাদের মধ্যে এত প্রেরণা সৃষ্টি করতে এবং তাঁদের উপর এত আশা পোষণ করতে একমাত্র গান্ধীজীকে দেখা যায়। তাঁর সেই আশার কথা বোনেরা যদি বুঝে নেয়, তবে তারা অনেক কাজ করতে পারবে।

এক সময় ছিল যখন রণরঙ্গিণী নারী হিসেবে ঝান্সি-রাণীর নাম শোনা যেত। রণাঙ্গণে ত এক-আধজন বোনই যুদ্ধ করতে পারে। কিন্তু শান্তিসেনায় প্রত্যেকটি বোন কাজ করতে পারে। এতে করারই বা কী আছে? কেবল শান্তিতে থাকা। রাগ করতে হলেও ত কিছু করতে হয়, চোখ বড়ো করতে হয়। কিন্তু এসব কিছুই করতে হবে না, কেবল শান্ত হয়ে দাঁড়িয়ে থাকতে হবে। এইজন্যই আমি চাইছি যে বোনেরা লোকসেবক-সংঘ গঠন করে নিয়ে পুরুষদের বলবে—'তোমরা ছেলেরা রাজনৈতিক দল সৃষ্টি করে পরস্পর লড়াই করতে থাক! আমরা মায়েরা ওতে নেই। আমরা শান্তিসেনার কাজ করব।' নারীদের জন্য আমার এই আহ্বান।

নারী ও ব্রহ্মবিদ্যা

ভূগোল, রাজনীতি, গণিত প্রভৃতি বিষয়ে পুরুষেরা পারঙ্গম হতে চায়, তা হোক, কিন্তু নারীদের আয়ত্ত করতে হবে মুখ্যত ব্রহ্মবিদ্যা। আমি কস্তুরবা সংস্থার বোনেদের দৃষ্টিও এদিকে আকৃষ্ট করেছি। আমি তাদের বলেছি—'তোমাদের উপর শিক্ষার ভার রয়েছে। কিন্তু তোমরা যে শিক্ষা দিচ্ছ, তাতে ব্রহ্মবিদ্যার অভাব থাকার দরুন সে-শিক্ষা কোন কাজে আসবে না। 'বিশ-বাইশ বছরের একটি মেয়ে যখন প্রতিকূল পরিবেশের মধ্যে

গ্রামে একা-একা কাজ করবে, তখন আধ্যাত্মিক শক্তি ছাড়া সে কী করে টিকে থাকতে পারবে ?'

সম্প্রতি আমি চিতোর থেকে আসছি। সে স্থান নারীদের স্থান। মীরার কত ত্যাগ ও সাহস ছিল! সেইযুগের সমস্ত কুলমর্যাদা বিসর্জন দিয়ে তিনি বেরিয়ে এসেছিলেন। তিনি যে সাহসের পরিচয় দিয়েছিলেন তা ভারতের ইতিহাসে উজ্জ্বল হয়ে আছে। রাজস্থানে আজও যেখানে পর্দার রেওয়াজ রয়েছে দেখতে পাওয়া যায় সেখানে কত যুগ আগে মীরা পর্দা ছিঁড়ে ফেলে দিয়ে নেচে-নেচে গেয়েছিলেন :

'পগ ঘুঁঘরু বাঁধ মীরা নাচী রে!'

লোকেরা তাঁকে পাগল বলত। কিন্তু সেদিকে তাঁর ভ্রূক্ষেপও ছিল না। এসব শক্তি তিনি কোথা থেকে পেয়েছিলেন? বিয়ের কথা চলছিল ত মীরা বলেছিলেন, 'আমি ত গোপালের শ্রীচরণ দাসী।' তবুও মীরার বিয়ে হয়ে গেল। কিন্তু মীরা তাঁর স্বামীর জীবন পর্যন্ত পরিবর্তন করে দিলেন। স্বামী আর স্বামী না থেকে ভক্ত হয়ে গেলেন।

মীরার মতো শ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংস দেবেরও একই অবস্থা হয়েছিল। রামকৃষ্ণকে প্রথমে সবাই পাগল মনে করত। তিনি তাঁর স্ত্রীকে দেবীরূপে পূজা করতেন। দেবীমূর্তির সামনে ফুল, গন্ধ, আরতি দিয়ে যেমন পূজা করা হয়, শ্রীরামকৃষ্ণও স্ত্রীর সামনে ঠিক তেমনভাবে পূজা করতেন। এতে স্ত্রীর জীবনও পরিবর্তিত হয়ে গেল।

আমি বলতে চাইছি যে, শ্রীরামকৃষ্ণদেব ও মীরাবাঈ-এর মধ্যে যে শক্তি ছিল তা ব্রহ্মবিদ্যার শক্তি ছিল। নারীদের মধ্যে এই ব্রহ্মবিদ্যার অত্যন্ত প্রয়োজন। হৃদয়ে যদি তীব্র আকাঙ্ক্ষা জাগে, হৃদয় যদি ছটফট করতে থাকে, তবে চাওয়া মাত্র ব্রহ্মবিদ্যা লাভ করা যায়। আমি চাই ব্রহ্মবিদ্যালাভের তীব্র আকাঙ্ক্ষা প্রত্যেকের হৃদয়ে জাগুক।

আজমীর, ২৮. ১. ৫৯

ব্রহ্মবিদ্যা-মন্দিরের কল্পনা

গত দশ-বার দিন থেকে আমি ব্রহ্মবিদ্যা-মন্দির সম্বন্ধে আলোচনা আরম্ভ করেছি। আমার মনে এই বিচার চার-পাঁচ বছর ধরে চলছিল। ভূদান আন্দোলন গত আট বছর ধরে চলছে এবং এর মধ্যে মানসিক সংশোধনের অনেক সুযোগ পাওয়া গেছে। আমার মনে হচ্ছিল শংকরাচার্য ও রামানুজ যে পরম্পরা রেখে গেছেন তার অধ্যয়ন ও অনুসরণ শত-শত বছর পরেও ভারতে চলছে। ভারতের সমস্ত মহাপুরুষের উপর তার প্রভাব পড়েছে। ঐ শ্রেণীর বিভূতিসম্পন্ন ব্যক্তিত্ব ছিল এযুগের শ্রীরামকৃষ্ণ ও গান্ধীজীর। এই যুগের বড়ো ভাগ্য যে এতে আরো কিছু নাম পাওয়া যায়, যাঁরা স্ব-স্ব ক্ষেত্রে ভারতে অদ্বিতীয়। পরাধীনতার সময় ভারত-মাতা আট-দশজন প্রথম শ্রেণীর রত্নকে জন্ম দিয়েছেন। তাঁদের মধ্যে বোধহয় এই দুইটি নাম এবং সেইসঙ্গে আরও দুই-তিনটি নাম হাজার-হাজার বছর ধরে স্মরণীয় হয়ে থাকবে।

সাধারণত আমার কাছে নামের গুরুত্ব নেই। কারণ আমি মনে করি, যার নাম দুনিয়া জেনে গেছে, তিনি দুনিয়ার শ্রেষ্ঠ পুরুষ নন। বরং তিনিই শ্রেষ্ঠ পুরুষ যাঁর নাম দুনিয়া জানে না। এরজন্য নামের গুরুত্ব নেই। তাহলেও শংকরাচার্য-রামানুজের পরম্পরার মতো জ্ঞানপরম্পরার অধিকারী ছিলেন গান্ধীজী, যাঁর সঙ্গে আমার ব্যক্তিগত পরিচয় ছিল। শ্রীরামকৃষ্ণ, শ্রীঅরবিন্দ, স্বামী দয়ানন্দ, তিলক মহারাজ ও রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর —সকলের সাহিত্য অধ্যয়ন করার সুযোগ আমি পেয়েছি এবং পূর্ব পরম্পরার উত্তম ফলস্বরূপ এক পরিপূর্ণ জীবনদর্শন আমি গান্ধীজীর বিচারধারার মধ্যে পেয়েছি।

জীবন ও বিচার

জীবনের যত মূল্য, বিচারধারার তত নয়। গান্ধীজীর বাণীতে যা ব্যক্ত হয়েছে তার চেয়ে অনেক বড়ো ছিল তাঁর জীবন। দুনিয়ায় কম-বেশী এমন আরো

উদাহরণ পাওয়া যায়, যেখানে বাণীর চেয়ে জীবন শ্রেষ্ঠ হয়ে দেখা দিয়েছে। বাণী সূক্ষ্ম বলে তা পরে শ্রেষ্ঠ হয়ে থাকে। এমন উদাহরণ এখনও পাওয়া যায় যেখানে বাণী ও আচরণ সমান হয়ে দেখা দিয়েছে। অনেক সৎপুরুষ থাকেন যাঁদের এক্‌স্‌প্রেশন (ভাব-প্রকাশ) দুর্বল। গান্ধীজী লেখাপড়া জানা লোক ছিলেন, তাঁর ভাব-প্রকাশও ভালো ছিল। কিন্তু এসবের চেয়ে তাঁর জীবন ছিল অনেক শ্রেষ্ঠ।

বার-বার আমার মনে হয় যে, এমন পরিপূর্ণ ও সাঙ্গোপাঙ্গ বিচার আমরা পেয়েছি, এখন আমাদের জ্ঞানপরম্পরা চালিয়ে যেতে হবে। আজ যে আমি ঘুরছি, এ-ও বিচার-প্রচারই। ভূদান-গ্রামদান এক নিমিত্তমাত্র, এক বাহ্য অবলম্বন মাত্র। বাহ্য অবলম্বন ছাড়াও বিচার-প্রচার হতে পারে। যেমন মহাবীর করেছিলেন। কিন্তু বাহ্য অবলম্বন থাকলে বিচার-প্রচার সহজে হয়, যেমন গৌতম বুদ্ধ করেছিলেন। ব্যক্তিগতভাবে আমি এ ব্যাপারে মহাবীরের মত পোষণ করি। কিন্তু এ এক বাহ্য সাধন পাওয়া গেছে। একে আমি মুখ্যত বিচার-প্রচারের সাধন হিসেবেই ধরে নিয়েছি।

জ্ঞান-বীজ গভীরে যাওয়া চাই

আমি চিন্তা করছিলাম—এই জ্ঞান-বীজ কী করে গভীরে যাবে? মনে হল—শংকরাচার্য-রামানুজের কাছে যেসব জিনিস ছিল, গান্ধীজীর কাছে তার চেয়ে একটি জিনিস কম ছিল। তাঁরা দুজনেই মিষ্টিক ছিলেন, অনুভবী ভক্ত ছিলেন, জ্ঞানী ছিলেন। এ ছাড়া দুজনেই সমাজসংস্কারক ও কর্মযোগী ছিলেন। তাঁরা সারাভারত ঘুরেছেন। শংকরাচার্যের আয়ু অল্প ছিল এবং তা পুরোপুরি তিনি ভ্রমণে লাগিয়ে ছিলেন। রামানুজও অনেক ঘুরেছিলেন এবং শেষ জীবনে স্থির হয়েছিলেন। তবুও জীবনের সমস্ত দিক হাতে নেওয়ার প্রয়োজন তাঁদের ছিল না, এযুগে যেমন তার প্রয়োজন হয়েছে। পরাধীনতার দরুন স্বাধীনতালাভের কাজ গান্ধীজীকে হাতে নিতে হয়েছিল। এর ফলে কর্মযোগের বেশী অংশ তাতে ব্যয়িত হয়েছে। শংকর-রামানুজ অবশ্য এই

সুযোগ পাননি। কিন্তু সুযোগ পেলেও এতে একটি ন্যূনতাও থেকে গেছে। সমস্ত ধর্মের সার তত্ত্ব অহিংসা, সত্য প্রভৃতিকে আমরা গ্রহণ করেছি, কিন্তু সেসবের মূলে যে ব্রহ্মবিদ্যার বুনিয়াদ রয়েছে তা অলক্ষ্যে থেকে গেছে। ব্রহ্মবিদ্যাকে তুলে নেওয়া হয়নি।

ব্রহ্মবিদ্যাই বুনিয়াদ

ছোটবেলা থেকেই আমার আকর্ষণ ব্রহ্মবিদ্যার দিকে ছিল। তার অভাব ও প্রয়োজনীয়তা আমি অনুভব করতাম। গান্ধীজীর অবর্তমানে তা আরো বেশী অনুভূত হয়েছে। আর এখন ত দৃঢ়নিশ্চয় হয়ে গেছি যে আমাদের বুনিয়াদ যদি ব্রহ্মবিদ্যা না হয়, তবে এসব উপরকার জিনিস টিকবে না। অন্ততপক্ষে ভারতে ত টিকবেই না। কারণ ভারতভূমি তত্ত্বজ্ঞানের ভূমি। যীশুখৃষ্ট এ পর্যন্ত বলে শান্ত হয়ে গেলেন—'Love thy neighbour as thyself'. ঐ তত্ত্বজ্ঞানের বিস্তার তিনি করলেন না। তিনি যদি কেবল এতটুকুই বলতেন—'Love thy neighbour' অথবা 'Love thyself' তবে যথেষ্ট ছিল। কিন্তু তিনি বলেছেন—নিজের প্রতিবেশীকে তেমনই ভালোবাস, যেমন নিজেকে ভালোবাস। প্রতিবেশীকে ভালোবাসা ব্যবহার-ধর্ম। এ মানবজাতির বিকাশের জন্য এবং আনন্দানুভূতির জন্য প্রয়োজন। কিন্তু তিনি নিজেকে যেমন প্রতিবেশীকেও তেমনই ভালোবাসতে বললেন। যদি ব্রহ্মবিদ্যা পর্যন্ত আমরা না পৌঁছি, তবে এ অসম্ভব।

মা সন্তানকে বোধহয় নিজের চেয়েও বেশী ভালোবাসেন। অন্তত নিজের মতো ভালো ত বাসেনই। এরজন্য তাঁর ব্রহ্মবিদ্যার প্রয়োজন হয় না, কারণ সন্তান ত তাঁর শরীরেরই এক অংশ। কিন্তু আত্মা এক—এই অনুভূতি ছাড়া যীশুর উপদেশ অনুসরণ করা সম্ভব নয়। ভারতে যদি কেউ বলেন—প্রতিবেশীকে ভালোবাস, তবে সঙ্গে-সঙ্গে প্রশ্ন করা হবে—কেন? ভালোবাসতে হবে কেন? এর কারণই-বা কি—এসব প্রশ্ন আসবে। কারণ এ ভূমি ব্রহ্মবিদ্যার ভূমি। এর উত্তর গীতা দিয়েছে, উপনিষদ দিয়েছে।

আজই আমার কাছে একটি বই এসেছে। রাধাকৃষ্ণণ উপহারস্বরূপ পাঠিয়েছেন। বইয়ের শুরুতে গান্ধীজী সম্বন্ধে একটি কথা আছে। বইটি গান্ধীজীকেই সমর্পণ করা হয়েছে। কথাটি হচ্ছে—'সার্মন অন দি মাউন্টও আমাকে এত সমাধান দিতে পারেনি যা গীতা দিয়েছে।' এর কারণ অন্য কিছু নয়। উভয়ে একই জীবনধর্ম শিক্ষা দিয়েছে। কিন্তু সেই জীবনধর্মের বুনিয়াদ যে ব্রহ্মবিদ্যা তা গীতায় পাওয়া যায়।

বিচারের অখণ্ড ধারা

এজন্য আমার মনে হচ্ছিল যে আমাদের আন্দোলনে কিছু অল্পতা থেকে গেছে। এ আয়ত্ত না করতে পারলে আমাদের এ বিচার অখণ্ড ধারায় প্রবাহিত হতে পারবে না। এ এক শ্রেষ্ঠ বিচার এবং তা দুনিয়ার সৎব্যক্তিদের প্রেরণা দেবে—এ আলাদা কথা। কিন্তু এতে যেভাবে এর ধারা প্রবাহিত হওয়া দরকার, তা হবে না। সেইজন্য আমি মনে-মনে এই নির্ণয় করলাম আমার মধ্যে সেই শক্তি আছে কি নেই তার বিচার না করেই ব্রহ্মবিদ্যা-মন্দির শুরু করে দেয়া হোক। শক্তির চেয়ে ভক্তি শ্রেষ্ঠ! আমার মধ্যে হয়ত তত শক্তি নেই, কিন্তু বিচারের উপর আমার ভক্তি অবশ্য আছে। এই ভক্তির উপর নির্ভর করে ব্রহ্মবিদ্যা-মন্দির প্রতিষ্ঠিত হতে চলেছে। স্থানের আগ্রহ আমার কখনো ছিল না। ভবিষ্যতে স্থানের পরিবর্তন হতেও পারে, নাও হতে পারে। এখন ব্রহ্মবিদ্যা-মন্দির পরম-ধাম-পওনারে প্রতিষ্ঠিত হবে।

মন্দিরের দায়িত্ব নারীদের

আমার এও মনে হয়েছে যে, এরূপ আশ্রম প্রতিষ্ঠার সমস্ত ব্যবস্থাপনা বোনেদের হাতেই থাকা উচিত। এরকম এক তৃষ্ণা আমার মনে ছিল। নারীদের সাধনা সর্বদা গুপ্ত থেকে গেছে! তাঁদের প্রভাব কোন না-কোন ব্যক্তির উপর নিশ্চয়ই পড়ে থাকবে, কিন্তু সেই সাধনা সর্বসাধারণ্যে বিকশিত হওয়ার অত্যন্ত প্রয়োজন রয়েছে। নয়ত শুধু পুরুষের দ্বারা বিশ্বশান্তি সম্ভব নয়। ব্রহ্মবিদ্যায় নারী-পুরুষের ভেদ নেই। এর মধ্যে উভয়েই থাকবে।

এ এইযুগের দাবি। বুদ্ধদেব ত প্রথম নারীদের প্রবেশাধিকারই দিতে চাননি। পরে যাও দিয়েছেন তাও এই বলে দিয়েছেন—'আমি এক বিপদের ঝুঁকি নিলাম।' কিন্তু ত' হল পুরানো যুগের কথা। আমি ত পুরুষদের সঙ্গে যদি নারীদের স্থান না থাকে তবে তাকেই বিপদ বলে মনে করি। তাতে ব্রহ্মবিদ্যা অসম্পূর্ণ থাকে। ব্রহ্ম খণ্ড খণ্ড হয়ে যায়। আমি মেয়েদের হাতে ব্রহ্মবিদ্যা-মন্দিরের ব্যবস্থাপনার ভার দিয়ে ব্রহ্মকে আবার টুকরো করতে যাচ্ছি না। যুগের প্রয়োজন রয়েছে, তাই সঞ্চালনের ভার মেয়েদের হাতে থাকলে তা সুরক্ষিতই থাকবে।

সহজভাবেই আমি এই বিচার আমাদের রাজম্মার (কেরলের মহিলা কর্মী) কাছে ব্যক্ত করেছি। এই বিচারটি তাঁর ভালো লেগেছে। যদি পছন্দ নাও হত, তবু আমার কল্পনার আশ্রমের প্রতিষ্ঠা হয়ে গেছে এরকম আমি মনে করতাম। আমি বলেছি—এ বিচার যদি তোমার পছন্দ হয়ে থাকে, তবে যেসব বোনেরা ছ-সাত বছর ধরে ভূদানযজ্ঞের কাজ করে আসছে তাদের সঙ্গে আলোচনা কর। রাজম্মার ব্যক্তিগত সম্পর্ক ও চিঠিপত্র লেখার ফলে পাঁচ সাতটি বোন ব্রহ্মবিদ্যা-মন্দিরে এসেছে।

সহযোগিতার আবেদন

বন্ধুদের কাছে আমার এই প্রার্থনা যে, তাঁরা যেন এই কাজে যতদূর সম্ভব সাহায্য করেন। ব্রহ্মবিচারের বুনিয়াদ সম্বন্ধে আমার যে-বিচার তার সংশোধনের প্রয়োজন আছে। সেই সংশোধন হোক বা না-হোক, আমরা যেন তা বুঝে নিয়ে আমাদের জীবন সেদিকে ঘোরাবার চেষ্টা করি। আমাদের বন্ধুরা বাহ্যিক প্রয়োজনীয় সাহায্য যা দেবার তা দিন। কিন্তু তার বোঝা যেন কেউ অনুভব না করেন।

কাশী, সীকর,

১৩. ৩. ৫৯.

পরিশিষ্ট

['নারীশক্তি'-র প্রথম সংস্করণ প্রকাশিত হওয়ার পর থেকে এ পর্যন্ত ভারতে নারীশক্তি বিকাশের একটি বিশেষ ধারা স্পষ্ট হয়ে উঠেছে। যার স্বরূপ বৈজ্ঞানিক ও গঠনাত্মক। প্রধানত পওনার ব্রহ্মবিদ্যা-মন্দিরের সাধিকারা এর নেতৃত্ব গ্রহণ করেছেন। তাঁদের প্রচেষ্টায় অখিল ভারত সর্বোদয় সমাজ সম্মেলনের মধ্যে মহিলা সম্মেলনও একটি স্থান করে নিতে পেরেছে। ১৯৭৩ সালে ভারতজুড়ে যে নারীশক্তি জাগরণ সপ্তাহ পালিত হয়েছে তা নারী-পুরুষ নির্বিশেষে সকলের দৃষ্টি ও শ্রদ্ধা আকর্ষণ করতে সক্ষম হয়েছে। গত মার্চ (১৯৭৪) মাসে ব্রহ্মবিদ্যা-মন্দিরে অখিল ভারত নারীশক্তি সম্মেলন হয়ে গেল। ভারতের প্রধানমন্ত্রী শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধী এতে অংশ গ্রহণ করেছিলেন। সম্মেলনের দ্বিতীয় দিন ৯ই মার্চ বিনোবাজী এবং ইন্দিরাজী ভাষণ দেন। প্রাসঙ্গিকতার দিকে লক্ষ্য রেখে ঐ দুটি ভাষণেরই সংক্ষিপ্ত অনুবাদ এখানে দেওয়া হল।—প. ব.]

বিনোবাজীর ভাষণ

মহিলা অর্থাৎ মহান

ভারতে নারীকে মহিলা বলে। দুনিয়ার অন্য যে ২০-২৫টি ভাষা আমার জানা তার মধ্যে এমন উন্নত শব্দ নেই,—না ইউরোপের না এশিয়ার ভাষাগুলির মধ্যে। মহিলার অর্থ মহান, শক্তিশালী। খুবই বড়ো শব্দ। এই শব্দই বুঝিয়ে দেয় নারী সম্বন্ধে ভারতের মত ও আশা কি। স্ত্রী শব্দ এসেছে 'স্তৃ' ধাতু থেকে। 'স্তৃ'-র অর্থ হচ্ছে বিস্তার করা, ছড়িয়ে দেওয়া। প্রেমকে সমস্ত দুনিয়ায় ছড়িয়ে দেওয়া নারীর কাজ। সংস্কৃত ভাষার এ এক বৈশিষ্ট্য যে তার শব্দ কথা বলে। অন্য ভাষার শব্দ তা করে না। . তাৎপর্য, প্রেমের ব্যাপকতা নারীর দ্বারা হবে।

নারীর বিশেষ শক্তি

গীতায় নারীর সাতটি শক্তির বর্ণনা আপনারা হয়ত পড়ে থাকবেন। এর আধারে সপ্তশক্তির উপর আমার একটি প্রবচন প্রকাশিত হয়েছে। **কীর্তিঃ,**

শ্রীঃ, বাক্, স্মৃতিঃ, মেধা, ধৃতিঃ, ক্ষমা—এই সাতটি নারীশক্তি। ভগবদ্ গীতা নারীদের কাছ থেকে কি আশা করেন তা এতে ব্যক্ত হয়েছে। এর চেয়ে বড়ো কথা যে, গীতা নিজেই মা। অম্ব। **অম্ব ত্বাং অনুসংদধামি**। প্রাচীনকাল থেকেই গীতাকে আমরা মাতৃরূপে ধ্যান করে এসেছি, দেখে এসেছি। তা ছাড়া গীতার চেয়ে শ্রেষ্ঠ দ্বিতীয় কোনো গ্রন্থ ভারতে নেই। বেদের থেকে বড়ো উপনিষদ, উপনিষদের থেকে বড়ো গীতা—এ আমাদের পরম্পরা। এবং এই গীতার প্রভাব সমস্ত জগতের উপর পড়েছে। জগতের এমন কোনো ভাষা, এমন কোনো ধর্মবিচার নেই যার উপর গীতার প্রভাব পড়েনি। কি আস্তিক, কি নাস্তিক সকলের কাছেই গীতা সমভাবে পূজ্য।

এত বিরাট শক্তি নারীদের মধ্যে রয়েছে এবং তাঁদেরই এই সম্মেলন। আসাম থেকে কেরল পর্যন্ত ভারতের সকল প্রদেশ থেকে বোনেরা এই সম্মেলনে এসেছেন। এর মধ্যে হিন্দু আছেন, জৈন আছেন, মুসলমান আছেন, খ্রীস্টানও আছেন। সকল ধর্মের বোনেরাই আছেন। আমার কাছে এ সম্মেলন খুবই গুরুত্বপূর্ণ।' আপনারা শুনেছেন হয়ত যে, 'য়ুনেঃ'ও ১৯৭৪ সালকে 'নারীবর্ষ'-রূপে পালন করছেন। তার সঙ্গে এই সম্মেলন স্বাভাবিকভাবেই মিলে গেছে।

কামনার দৃষ্টি ভুল দৃষ্টি

এত শক্তির আধার হওয়া সত্ত্বেও নারীকে পুরুষ কামিনী রূপে দেখে। নারীকে কাম-সাধনার বিষয়রূপে দেখা নারীশক্তির সর্বাপেক্ষা বড়ো অপমান।

মনুস্মৃতিতে মা সম্বন্ধে এক মূল্য নির্ধারিত হয়েছে—**উপাধ্যায়ান্ দশাচার্যঃ**। উপনয়নের সময় যিনি এক ছোটোরকমের মন্ত্র দান করেন তাঁকে উপাধ্যায় বলে। ঐরূপ দশজন উপাধ্যায়ের সমান হচ্ছেন একজন আচার্য। আচার্য মানে জ্ঞানদাতা। **আচার্যাণাং শতং পিতা**, অর্থাৎ পিতা একশ জন আচার্যের সমান। এ গেল সমতার ভাষা, সমানতার ভাষা। এর পরের বাক্য হচ্ছে—**সহস্রং তু পিতৃন্ মাতা গৌরবেণাতিরিচ্যতে**, মা হাজার পিতার চেয়েও

বড়ো। এখানে একথা বলা হয়নি যে মা হাজার পিতার সমান। বলা হয়েছে, মা হাজার পিতা থেকেও শ্রেষ্ঠ। ভারতের মাতৃগৌরব এত। কিন্তু আজ তা কামবাসনার বিষয়বস্তুতে পরিণত হয়েছে। অতএব নারীশক্তির বিকাশকল্পে প্রথম প্রহার হানতে হবে সেই সেই বস্তুর উপর যেগুলি থেকে কামবাসনার উদ্রেক হয়।

বিষয়-বাসনার ব্যাপক প্রচার

ঐ বস্তুগুলির মধ্যে প্রধান হচ্ছে সিনেমা ও তার পোস্টারগুলি। ভারতে ওগুলি এত খারাপ! তা আবার শিশুদেরও দেখানো হচ্ছে, বোনেদেরও, পুরুষদেরও। এভাবে সর্বত্র বিষয়বাসনার ব্যাপক প্রচার হয়ে চলেছে। এর বিরুদ্ধে আমি আন্দোলন পর্যন্ত করেছিলাম এবং তার প্রভাবও কিছু পড়েছিল। কিন্তু সরকারকে নির্ণয় করতে হবে যে, ভারতে খারাপ সিনেমা চলবে না। নারীশক্তির বিকাশ যদি কাম্য হয়, তাহলে এরকম নির্ণয় করতেই হবে।

মাতৃগৌরবের অবনতি

আপনারা হয়ত জানেন যে, রাশিয়ায় খারাপ সিনেমা হয় না। ইংল্যাণ্ড, আমেরিকা প্রভৃতি দেশে হয়, কিন্তু রাশিয়ায় হয় না। এর কারণ হচ্ছে, রাশিয়া মাতৃশক্তির গৌরব বাড়াতে চায়। প্রাচীনকাল থেকে ভারতও তাই চেয়ে আসছিল। কিন্তু এখন ভারতের অবস্থা কি? ভারতের লোকেরা সন্তানবৃদ্ধি চায় না, সন্তান চায় না। কারণ জমির অনুপাতে জনসংখ্যা খুব বেশী বেড়ে যাচ্ছে, খাদ্য কম মিলবে ইত্যাদি, ইত্যাদি। এইজন্য জন্মনিয়ন্ত্রণ করতে চাওয়া হচ্ছে। কিন্তু এ নিয়ে অনেক চিন্তা করার আছে।

জৈনদের দান—ব্রহ্মচর্য ও সংযম

জন্মনিয়ন্ত্রণ করতে হবে, ত তার উপায় কি? উপায় ত ঐ যা মহাবীর বলেছেন, যা ক্যাথলিকরা বলেছেন। মহাবীরের শিষ্যদের মধ্যে যত পুরুষ ছিল নারী তার চেয়ে কম ছিল না। বোনেদের তিনি ব্রহ্মচর্য ও সন্ন্যাসের দীক্ষা দিতেন। এ অধিকার আগে নারীদের ছিল না। ব্রহ্মচর্য ও সন্ন্যাস এই উভয়ের

অধিকার মহাবীর নারীদের দিয়ে দিলেন। আর ঐসব দীক্ষিত মহিলারা নিরন্তর ঘুরতে থাকলেন। আজও আপনারা দেখতে পাবেন ভারতের শক্তিবৃদ্ধির জন্য মহিলারা নানাস্থানে নিরন্তর ঘুরছেন। দুইজন কি তিনজন একত্র হয়ে পরিক্রমা করে থাকেন। ধর্মীয় পরিবেশ সৃষ্টি করা, লোকেদের সমস্ত দিক থেকে বুঝানো—এসব কাজ তাঁরা করে চলেছেন। জৈনদের যে শক্তি রয়েছে, যে বিরাট শক্তি তাঁরা ভারতে প্রকট করেছেন তার উপযোগিতা ও উপকারিতা মহান্। এ বছর মহাবীরের প্রয়াণের ২৫০০ বছর পূর্তি অনুষ্ঠান পালিত হচ্ছে। এই অনুষ্ঠানে ভারতের সবাই যুক্ত আছেন।

জৈনদের দ্বিতীয় গুরুত্বপূর্ণ আদেশ—মাংস খাওয়া উচিত নয়। জৈনরা আজ পর্যন্ত সে আদেশ পালন করে চলেছেন। জৈনদের মাংসাহার-মুক্তির সিদ্ধান্ত সমস্ত দুনিয়ার পক্ষেই গুরুত্বপূর্ণ। বিজ্ঞান কি বলছে? মানুষ যদি শাক-সব্‌জির উপর নির্ভরশীল হয়, তবে ধরুন, তার এক একর জমি লাগবে। যদি দুধের প্রয়োজন হয়, তাহলে তার লাগবে দুই একর জমি। আর যদি মাংসাহারী হয়, তবে তার লাগবে চার একর জমি। এদিকে ত জমির পরিমাণ উত্তরোত্তর কমে যাচ্ছে। সুতরাং এই বিজ্ঞানের যুগে মাংসাহার বর্জন করতেই হবে। বিজ্ঞানেরও এই আদেশ।

প্রাচীনকালে গৃহস্থাশ্রমের প্রতিষ্ঠা হয়। কিন্তু তখনও ব্রহ্মচর্যের মহিমা সেখানে ছিল। তার আধ্যাত্মিক মূল্য ছিল। ব্রহ্মচর্যের আধ্যাত্মিক মূল্য আজও আছে। এবং সেইসঙ্গে আজ যোগ হয়েছে তার সামাজিক মূল্য (social value)। সমাজে এখন বেশী সন্তানের প্রয়োজন নেই। এর অর্থ হল ব্রহ্মচর্যের আজ দুই দিক থেকে মূল্য বেড়েছে—এক, আধ্যাত্মিক (spiritual) দিক থেকে; দুই, সামাজিক দিক থেকে। এভাবে যে ট্রেনে ডবল ইঞ্জিন লেগে গেছে সে ট্রেনের কত বেগে চলা উচিত? আজ যদি কিছু করার থাকে, তবে তা হচ্ছে সংযম বাড়াবার কাজ। ব্রহ্মচর্যকে উৎসাহ দিতে হবে, প্রেরণা দিতে হবে। গৃহস্থাশ্রম চলবে, কিন্তু তা সংযমের সঙ্গে চলবে। তারজন্য কি করতে হবে?

বিহারে পদযাত্রার সময় আমি তুলসী-রামায়ণ শুনতাম। সেখানে দেখেছি গ্রামের লোক রামায়ণ ছাড়া অন্যকিছুই পড়েন না। বোনেদের সবাই তুলসী-রামায়ণ জানেন। তাঁরা অন্য কোনও গ্রন্থের কথা জানেন না। ভারতে ছাপাখানা হওয়ার পর যত বই প্রকাশিত হয়েছে তারমধ্যে সবচেয়ে বেশী বিক্রী হয় তুলসী-রামায়ণ। এ বছর তুলসী-রামায়ণের চতুঃশতীও (চারশত বৎসর পূর্তি) পালিত হচ্ছে। গত ৪০০ বছরে তুলসী-রামায়ণ আরো শক্তিশালী হয়ে গেছে। হোমিওপ্যাথিতে ওষুধ ঝাঁকালে যেমন তার শক্তি বাড়ে, তেমন ৪০০ বছর ধরে ঝাঁকানোতে তুলসী-রামায়ণের শক্তি বেড়ে গেছে। আর তা উত্তরোত্তর বেড়েই যেতে থাকবে। ত, বিহারে আমি রামায়ণ শুনছিলাম। আর তাঁদের আমার বুঝাবার ছিল যে, এই যুগে বেশী সন্তানের জন্ম দেওয়া ঠিক নয়। আমি তাঁদের জিজ্ঞেস করলাম, আপনারা রামায়ণ পড়েছেন? সভায় স্ত্রী-পুরুষ যাঁরা উপস্থিত ছিলেন সবাই বললেন, এ-ই ত একমাত্র গ্রন্থ যা আমরা পড়ি। আমি বললাম, রামচন্দ্র পুরুষোত্তম ছিলেন, তাঁর যে মাত্র দুটি পুত্র ছিল তা আপনারা কি জানেন? উত্তরে তাঁরা জানালেন, হ্যাঁ। আমি বললাম, পুরুষোত্তম রামচন্দ্রই যদি দুইটি মাত্র ছেলের জন্ম দিয়ে থাকেন, তাহলে আপনার-আমার কি অধিকার আছে যে আমরা দুইটি সন্তানের বেশী জন্ম দিতে পারি? (সম্মেলনে উপস্থিত বোনেদের হাস্য এবং তাঁদের উদ্দেশ্যে) আপনারা বিদুষী তাই হাসছেন, কিন্তু এ কথা শুনে বিহারের সেই বোনেরা কাঁদতে থাকলেন। তাঁদের চোখ থেকে অশ্রু বইতে লাগল। কারণ তুলসী-রামায়ণের উপর তাঁদের নিষ্ঠা ছিল। তাঁরা বললেন, আমাদের আজ পর্যন্ত কেউ এভাবে বোঝাননি। তাৎপর্য, সংযমের পরিবেশ সৃষ্টি করতে হবে, তবেই নারীশক্তি বিকশিত হতে পারবে।

আমি মহাবীরের কথা বলেছি, আর তুলসী-রামায়ণের। উভয়েরই জয়ন্তী হচ্ছে এ বছর। কিন্তু অনেকেই জানেন না যে, খ্রীশ্চিয়ানিটি সর্বপ্রথম এসেছিল ভারতে, তারপর যায় ইউরোপে। যীশু খ্রীস্টের প্রথম শিষ্য সেণ্ট থোমাস ভারতের মালাবারে এসেছিলেন এবং সেখান থেকেই খ্রীশ্চিয়ানিটি প্রসার লাভ করে।

ক্যাথলিকদের মধ্যে বোনেরা ব্রহ্মচারিণী হন। আজও আপনারা দেখবেন, নানা হাসপাতালে ক্যাথলিক মেয়েরা সেবা করছেন। তাঁরা ব্রহ্মচর্য-ব্রত ও যীশুর ক্রস্ গ্রহণ করে নানাস্থানে যাচ্ছেন, যীশুর কথা সকলকে শুনাচ্ছেন এবং হাসপাতালে সেবা করছেন। তাঁদের কাজ নিরন্তর সেবা করা। শোনা যায়, প্রতি একশ রোমান ক্যাথলিকের মধ্যে পাঁচজন 'নন্স্' অর্থাৎ সন্ন্যাসিনী হন। ভারতে গীতা কত বিক্রী হয়? খুব বেশী হলে বছরে চার লাখ? এ বছর ভারতে বাইবেল বিক্রী হয়েছে ষাট লাখ। নানাস্থানে ঘুরে-ঘুরে তাঁরা খ্রীস্টধর্মের এত ব্যাপক প্রচার করেন! এতে আমার খুব আনন্দ হয়। ত, মহাবীর ও যীশুখ্রীস্টের মতো আমাদেরও মেয়েদের স্বতন্ত্র ও শক্তিশালী করতে হবে। জ্ঞানেশ্বরীতে আছে—গীতার রূপ কেমন? ভগবান মোহরূপী মহিষাসুরকে বধ করার জন্য গীতা বলেছেন।

তাৎপর্য, নারীশক্তির বিকাশের জন্য সংযমের পরিবেশ সৃষ্টি করতে হবে। তারজন্য খারাপ সিনেমা একেবারে বন্ধ হয়ে যাওয়া চাই। এতে আপনারা যদি চান, তাহলে ঘেরাও প্রভৃতিও করতে পারেন। এমন কি পার্লামেন্ট এবং ইন্দিরাজীর ঘরের সামনেও ঘেরাও করতে পারেন।

নারীশক্তি-বিরোধী নীতি

এখন আমার দ্বিতীয় বক্তব্য রাখছি। দুইমাস আগে ইন্দিরাজী যখন এখানে এসেছিলেন তখন তাঁকে এ কথা বলেছিলাম। মদ্যপায়ী পতিদেব ঘরে এসে স্ত্রীকে মারধর করেন। এতে গরীবী ত হটেই না, উল্টো যে পয়সা মিলে তা মদে চলে যায় আর ঘরে এসে বোনেদের উপর মারপিট চলে। আপনারা জানেন এবং ইন্দিরাজীও হয়ত জানেন যে, ভারতে বোনেদের এক পদযাত্রা চলছে। তাঁদের ছ হাজার মাইল পরিক্রমা হয়ে গেছে। এবং তাঁরা ছটি রাজ্য ঘুরেছেন। এখন তাঁরা তামিলনাড়ুতে পৌঁছেছেন। তাঁদের মধ্যে একজন আছেন সিন্ধুর (পাকিস্তান), একজন পাঞ্জাবের, একজন আসামের। তাঁদের কাজের মধ্যে একটি হচ্ছে বিভিন্ন স্থানে মেয়েদের নিয়ে স্বতন্ত্রভাবে সভা করা এবং প্রত্যেকের সঙ্গে মন খুলে কথা বলা। এমনিতেই বোনেদের সামনে বোনেদের মন খুলে যায়। পদযাত্রী

বোনেদের অভিজ্ঞতা হল, বিভিন্ন প্রদেশের বোনেরা তাঁদের কাছে প্রশ্ন রাখেন—স্বামী মারপিট করেন, কী করি? মদ খেয়ে ঘরে আসেন ত পতিদেবের চৈতন্যই থাকে না। আর আমরা ভারতময় সর্বত্র মদের দোকান খুলে দিয়েছি! এতে পয়সা পাওয়া যায়! মারাঠীতে একে বলে 'পৈশাচীবৃত্তি'। এর অর্থ হচ্ছে, পিশাচের বৃত্তি!

রাজাজীকে একজন জিজ্ঞেস করেছিলেন, 'আপনি দীর্ঘায়ু লাভ করেছেন; আহার ত করেন খুব কম, তবু এত শক্তি কী করে থাকে? এর কারণ কি?' রাজাজী উত্তরে বলেছিলেন, 'কারণ ত একটিই। আমি আমার রাজ্যে মদ্যপান নিষেধ করেছি। এর ফলে গরীব বোনেরা আমাকে আশীর্বাদ করেন। তাঁদের জীবন আনন্দে চলে। মারপিট হয় না। ঘরে শান্তি বিরাজ করে। তাঁদের সেই আশীর্বাদের জোরেই আমি দীর্ঘায়ু হয়েছি।'

অন্নং বহু কুর্বীত

উপনিষদে নির্দেশ রয়েছে—**অন্নং ব্রহ্মেতি ব্যজানাত্‌—অন্নং বহু কুর্বীত, তদ্‌ ব্রতম্‌**। অন্ন হচ্ছে ব্রহ্ম, অন্ন প্রচুর উৎপাদনের ব্রত গ্রহণ কর। যেমন অহিংসা ব্রত, সত্য ব্রত বলা হয়েছে, তেমনই বলা হয়েছে—অন্নের উৎপাদন খুব বাড়াও, একে ব্রত রূপে গ্রহণ কর। উপনিষদ কোনও প্ল্যানিং কমিশনের মতো জিনিস নয়। উপনিষদ হচ্ছে ব্রহ্মবিদ্যা। কিন্তু ব্রহ্মবিদ্যার সঙ্গে-সঙ্গেই উপনিষদের ঋষি এও জানেন যে, অন্ন প্রথম ব্রহ্ম। তা পেটে না গেলে সর্বত্র অগ্নি তড়িৎ বেগে জ্বলে উঠবে। ঐ অবস্থায় কোনও আধ্যাত্মিক বিষয় আসতেই পারে না।

রাষ্ট্রপতি এসেছিলেন এবং খাদ্যশস্যের স্বল্পতার কথা বলছিলেন। আমি বললাম, আপনারা যে ল্যাণ্ড ট্যাক্স (ভূমিরাজস্ব) আদায় করেন তা ফসলের মাধ্যমে নিন। জমি 'রিঅ্যাসেস' করে ঘোষণা করে দিন যে, অমুক জমি থেকে আগামী দশ বছর এত খাদ্যশস্য নেব। এতে সরকারের হাতে কিছু ফসল আসবে

এবং তা সরকারী কর্মচারীদের কিছু-কিছু দেওয়া যাবে। একটি ভালো কাজ হবে।

আপনারা প্রশ্ন করতে পারেন যে, এর সঙ্গে নারীশক্তির সম্বন্ধ কি। মেয়েদের রান্নাবান্না করতে হয় এবং বাচ্চাদের খাওয়াতে হয়। কি খাওয়াবেন আর নিজেরাইবা কি খাবেন এই প্রশ্ন তাঁদের সামনে আসে। যে পর্যন্ত ঘরে প্রয়োজনীয় খাদ্যের ব্যবস্থা না থাকবে, ঘর সমৃদ্ধ না থাকবে, সেপর্যন্ত নারীশক্তি বিকশিত হতে পারবে না, সমৃদ্ধ হতে পারবে না।

পর্দা প্রথা দূর হোক

নারীদের যদি শক্তিশালী করতে হয়, তাহলে তাঁদের পর্দার বাইরে আনতে হবে। পর্দা নারীদের শক্তিবিকাশের পথে খুব বেশী বাধা সৃষ্টিকারী। বিশেষ করে রাজস্থান, উত্তরপ্রদেশ ও বিহারে মুসলমানদের প্রভাবে এ এক প্রথা রূপে চলে আসছে। বিহারে দেখেছি মায়েরা তুলসী-রামায়ণ পড়েন, বাচ্চাদেরও শোনান, ঘরের কাজকর্ম করেন, কিন্তু ঘর থেকে বাইরে আসেন না। সবাই 'শ্রীঅরবিন্দ'! শ্রীঅরবিন্দ একই কামরায় ৩০।৩৫ বছর ছিলেন। আর ঐসব মায়েরা সারা জীবন এক কামরায় থাকেন। সুতরাং তাঁরা সবাই অরবিন্দ! তাঁদের যদি বাইরে আনতে হয় তবে পর্দা তুলে দিতে হবে।

আগামী যুগ নারীদের

যে যুগ আসছে তা নারীদের যুগ। যতদিন পর্যন্ত প্রধান নির্ভরতা ছিল মিলিটারী অর্থাৎ সেনার উপর, ততদিন পর্যন্ত পুরুষদেরই রাজত্ব চলা সম্ভব ছিল। কিন্তু এখন দুনিয়া ধীরে-ধীরে অস্ত্র-পরিহারের দিকে এগিয়ে যাচ্ছে এবং সারা দুনিয়ায় অহিংসার রাজত্ব প্রতিষ্ঠিত হতে চলেছে। এই শক্তিবিকাশে, অহিংসাশক্তি বিকশিত করার কাজে নারীরাই বেশী সফলকাম হবেন। আগামী যুগ—নারীদের যুগ। সুতরাং তাঁদের পর্দার বাইরে আসতে হবে এবং তখন নারীশক্তি জেগে উঠবে।

শরীয়ত বা ধর্মশাস্ত্র বদলায়

নারীশক্তির জন্য আর কি করতে হবে? মুসলমানদের মধ্যে এক স্বামীর তিন-চারটি স্ত্রী থাকে। আমাদের রাষ্ট্র ধর্মনিরপেক্ষ রাষ্ট্র। সেক্যুলার বা ধর্ম-নিরপেক্ষ বলা সত্ত্বেও এরকম অদ্ভুত আইন রয়েছে যা নারীদের পক্ষে কষ্টদায়ী। ঘরে তিন-চারটি সতিন থাকলে কতই না ঝগড়া-বিবাদ হতে থাকে, সেখানে কেমন শান্তি বিরাজ করে আপনারা তা সহজেই কল্পনা করতে পারেন। বলা হয়ে থাকে এর কারণ নাকি মুস্‌লিম ল (আইন)। কিন্তু বিনোবা অত বোকা নন। তিনি কমপক্ষে তিরিশ বছর কুর্‌আন্ শরীফ অধ্যয়ন করেছেন। এবং তার সার প্রকাশিত হয়েছে 'রুহুল কুর্‌আন্' নামে। কুর্‌আনে যে প্রধান বস্তু রয়েছে তাকে 'উম্মুল কিতাব' অর্থাৎ কুর্‌আনের সার অংশ বলা হয়। এতে ভগবান কেমন, তাঁর স্বরূপ কি, কি করে তাঁকে ভক্তি করতে হবে, দান-ধর্ম করা ইত্যাদি যেসব ধর্মবিচার রয়েছে তাই মুখ্য। বাকী সব আপনারা যাকে নিয়ম বা আইন বলেন, যা 'শরীয়ত' তা উত্তরোত্তর বদলাতে থাকে। মুহম্মদ পয়গম্বরের সময়ও বদলেছে, পরেও বদলেছে। কিন্তু বলা হয়ে থাকে এর পরিবর্তনের দাবি মুসলমানদের পক্ষ থেকে করা হলে ভালো হয়। মুসলমানদের পক্ষ থেকে কিছু দাবি উঠেছেও। আমি এর বিরোধী নই, ঠিক আছে, কিছু দাবি দেখে নেওয়া ভালোই। কিন্তু তাদের বুঝাতে হবে যে, প্রতিটি স্ত্রীর সঙ্গে সমান ব্যবহার করা অসম্ভব ব্যাপার। সেইজন্যে বহুবিবাহ প্রথার অবসান হওয়া চাই। তবেই নারীদের শক্তি বাড়বে।

বরপণ থেকে মুক্ত হওয়া চাই

আর একটি কথা। বিয়েতে পণ দেওয়া হয়ে থাকে। অর্থাৎ মেয়েকে ত দান করা হয় সেইসঙ্গে কিছু যৌতুক। 'স্ত্রী-ধন' হিসেবে কিছু যৌতুক যার উপর অন্য কারো অধিকার নেই। আমি এরূপ 'দহেজ' বা যৌতুকের বিরোধ করি না। আমি 'লহেজ' বা লোভের বিরোধী, ছেলেকে নিয়ে ব্যবসার বিরোধী। ছেলে

এম. এ. পাশ করেছে, তারজন্য এত খরচ হয়েছে, তা কন্যাপক্ষ থেকে আদায় করার বিরোধী। আমি একটি সূত্র তৈরি করেছি—'এক শাদী ইয়াণী জিন্দগীভর কী বরবাদী'। ত, 'লহেজ' বা বরপণের বিরোধ করতে হবে। এ ব্যাপারে মেয়েদেরও বোঝাতে হবে। তাহলে নারীশক্তির বিকাশ হবে।

শোষণের আর এক রূপ

সর্বশেষ কথা হচ্ছে ভাঙ্গীমুক্তি হলে নারীশক্তি জাগবে। আমি ইন্দোরে এবং অন্যান্য শহরে দেখেছি শৌচাগার থেকে ময়লা আনার কাজ করেন মেয়েরা আর পতিদেবরা বসে থাকেন গাড়ীর উপর। ভেতরে ঢুকে ময়লা আনা, গাড়ীতে ঢালা প্রভৃতি সমস্ত নোংরা খাঁটার কাজগুলি করেন বোনেরা। তাৎপর্য, ভাঙ্গীরাও সর্বদা বোনেদের শোষণ করে।

নারীশক্তির জন্য কি-কি করতে হবে তার যৎসামান্য হিসাব আপনাদের কাছে রাখলাম। এখন ইন্দিরাজী অনুগ্রহ করে তার বিচার আপনাদের সামনে রাখবেন। এ খুবই গুরুত্বপূর্ণ। কারণ তিনি স্বয়ং নারী।

পওনার ৯. ৩. ৭৪

ইন্দিরাজীর ভাষণ

বাবার (বিনোবাজীর) ভাষণের পর আমি কি বলব তা বুঝতে পারছি না। আমি যখনই এখানে আসি বাবার আশীর্বাদ নেওয়ার জন্য আসি। অবশ্যি এবার আসার আরও একটি কারণ রয়েছে। তা হচ্ছে, এখানে আমাদের বোনেরা সারা ভারত থেকে এসেছেন, তাঁদের সঙ্গেও সাক্ষাৎ করার সুযোগ গ্রহণ করা।

নারীশক্তি প্রসঙ্গে দ্বিমত হতে পারে না। প্রাচীন কালে যেমনই থাক আমাদের যুগে বাপুজীই নারীশক্তিকে জাগিয়ে তুলেছেন। কেবল এইজন্যই নয় যে নারীশক্তি উত্তম, এইজন্যও যে ঐ সময় এক বিশেষ সমস্যা সামনে ছিল, স্বাধীনতার সংগ্রাম ছিল। প্রত্যেক পরিবারকে তারজন্য কষ্ট সহ্য করতে হত, অসুবিধা ও বিপদের সম্মুখীন হতে হত। বাপুজী ঠিকই ডাক দিয়েছিলেন যে,

এই সংগ্রামে যদি অর্ধেক জনসংখ্যাই পিছিয়ে থাকে, তাকে না বোঝে, তবে সংগ্রাম কখনই সফল হতে পারে না। কত বোন আটকে পড়ে থাকেন, তাঁদের পথ বন্ধ হয়ে থাকে। পর্দা এবং আরও কত কারণে তাঁদের পথ অবরুদ্ধ থাকে। আর আজ থেকে পঞ্চাশ বছর আগে তাঁদের কতই না বাধা ছিল। সেই সময় গান্ধীজী মেয়েদের ডাক দিয়েছিলেন এবং তাঁর ডাকে সাড়া দিয়ে লক্ষ-লক্ষ নারী সংগ্রামে যোগ দিয়েছিলেন, সমস্ত বাধা অতিক্রম করেছিলেন।

গান্ধীজীর কাজ

গান্ধীজীর সেই আন্দোলন এখনও সম্পূর্ণ হয়নি। ঐ কাজের একটি লক্ষ্য ছিল রাজনৈতিক স্বাধীনতা লাভ। আমরা সেই পর্যন্ত পৌঁছেছি। কিন্তু গান্ধীজী যে স্বপ্ন দেখেছিলেন ও আমাদের সামনে রেখেছিলেন এবং বাবাও সর্বদা যে ছবি সামনে তুলে ধরছেন, সে লক্ষ্যে পৌঁছাতে আমাদের যথেষ্ট সময় লাগবে। এ খুব দীর্ঘ ও কঠিন পথ। প্রথম লক্ষ্যে পৌঁছাতে নারীশক্তির যে প্রয়োজন ছিল দ্বিতীয় লক্ষ্যে পৌঁছাতে তার চেয়ে অনেক বেশী শক্তির প্রয়োজন।

সমস্যা বেড়েছে

বর্তমানে আমাদের চারিদিকে নানা সমস্যা দেখা দিয়েছে। আগে যা ছিল তা থেকে অনেক বেড়েছে। বাড়বার কিছু কারণ আছে। কিছু জিনিস চাপা ছিল, তা উপরে উঠেছে। যেমন জল শান্ত থাকলে তা পরিষ্কার থাকে, তাতে মাটি থাকে না। কিন্তু জল যদি নেড়ে দেওয়া হয়, তাহলে তা ঘোলাটে হয়ে যায়, নীচের মাটি উপরে উঠে আসে। বর্তমান অবস্থাও ঠিক তেমন। সমস্যাগুলি বেড়ে যাওয়ার একমাত্র কারণ যে এই তা নয়। এ একটি কারণ। আমাদের সমাজে এবং সারা বিশ্বেও অনেক পরিবর্তন আসছে। কিছু বিজ্ঞানের জন্য, কিছু যন্ত্রবিদ্যার জন্য যেসব সমস্যা চাপা ছিল তা বেরিয়ে পড়ছে। বাবা ঠিকই বলেছেন যে, এইসব সমস্যার বিরুদ্ধে নারীরা যত সংগ্রাম করতে পারেন, তত অন্য কেউ পারেন না। সেইজন্য বর্তমান যুগে নারীশিক্ষার গুরুত্ব অনেক।

ভালো-মন্দ প্রয়োগের উপর নির্ভরশীল

এ ত বলা যায় না যে, বিজ্ঞান খারাপ অথবা কোনও নতুন বিচার খারাপ বা ভালো। প্রশ্ন হচ্ছে সেই বিচারের, তা সে বিজ্ঞানই হোক আর শিল্পবিদ্যাই হোক, প্রয়োগ মানুষ কীভাবে করল? প্রয়োগ খারাপ হলে তা খারাপ হয়ে যায়। সমাজেও আমরা এ-ই দেখি। নতুন কোনও জিনিসের ব্যবহার যদি আমরা ঠিক ভাবে না করি, দুঃখীকে সাহায্য না করি, তাহলে তা থেকে কষ্ট বেড়ে যায়। ঠিক ঠিক ব্যবহার করলে তা আমাদের সহায়তা করে। এসব জিনিস নিজের থেকেই খারাপ বা ভালো হয় না। যেমন ধন-সম্পদের কথা বাবা এইমাত্র বললেন। পঞ্চাশ বছর আগে আমাদের সামনে বিজ্ঞানের চিত্র এসেছে। আমরা পুরাপুরিভাবে বিশ্বাস করেছিলাম যে, এ এক এত বড়ো হাতিয়ার আমরা পেয়েছি যার দ্বারা মনুষ্যসমাজের সমস্যাবলী বহুলাংশে দূর করা সম্ভব হবে। কিন্তু যে কার্যক্রমই গ্রহণ করা হয়, আমাদের দেশে বা অন্য দেশে, তার পরিণাম এই হয় যে সমস্যা বেড়ে যায়। বিভেদ বেড়ে যায়।

জনতার মধ্যে পরিবেশের সৃষ্টি হোক

বাবা খারাপ সিনেমা বন্ধ করার কথা বলেছেন। বাবার সঙ্গে আমি একমত যে, এখানকার সিনেমা অধিকাংশই ভালো নয় এবং এসবের প্রভাব ভালো হয় না। সাধারণত, যে সিনেমা ভালো নয় তা-ই বেশী চলে। সরকারের পক্ষ থেকে ভালো সিনেমা তৈরীর জন্য সহায়তাও করা হয়, কিন্তু মুশকিল হচ্ছে সেসব কেউ দেখতে চায় না। এ যদি চালিয়েও যাওয়া হয়, এবং এ বিষয়ে আরও গবেষণা করা হয়, তবু বলা যায় না যে লোক তা দেখবে কি দেখবে না। খুবই অল্প সংখ্যক লোক ভালো সিনেমা দেখতে চায়। রাশিয়ার পক্ষে এ সহজ, চীনের পক্ষেও। কারণ সেসব দেশের সামাজিক কাঠামো এমন যে সরকারই সব ঠিক করে দেয় জনতা কি দেখবে, কি পড়বে, কি করবে। আমরা সেরকম কাঠামো গ্রহণ করিনি। কারণ আমরা মনে করি যে, ঐরকম কাঠামোতে বিপদও আছে। যাঁর হাতে শক্তি থাকে তিনি

সেই শক্তিকে খারাপ পথেও নিয়ে যেতে পারেন, ভালো পথেও নিয়ে যেতে পারেন। কিন্তু আমাদের দেশের কাঠামো অন্যরূপ। নারীশক্তি দ্বারা, এবং পুরুষশক্তি দ্বারাও, জনশক্তিকে জাগ্রত করে দেশে পরিবর্তন আনতে হবে। জনসাধারণ যদি কোনও জিনিস না চায়, তাহলে সে জিনিস এদেশে চলবে না। সুতরাং এরজন্য পরিবেশ সৃষ্টি করতে হবে। এমন অনেক নিয়ম রয়েছে যার কোনও প্রভাব নেই, কারণ সমাজে তা মেনে চলার মতো পরিবেশের সৃষ্টি হয়নি।

নারীশক্তি সম্বন্ধে বাবা বলেছেন। কিন্তু আজও আমাদের দেশে বাল্যবিবাহ চলছে। ইংরেজদের আমলে আইন এর বিরুদ্ধে ছিল, তবু বাল্যবিবাহ চলত। আজও গাঁয়ে-গাঁয়ে তা চলছে। আমি দেখেছি, এমনকি, আমাদের বাড়ীতে যারা কাজ করে তারাও বাল্যবিবাহ দেয়। আমি তাদের তিরস্কার করেছি, বাধা দিতে চেষ্টা করেছি, কিন্তু সফলকাম হইনি। তারা বলেছে, 'আপনার কথা বিলকুল ঠিক। কিন্তু আমরা গাঁয়ে থাকি, সেখানে চলেছে অন্য বিচারধারা। আমাদের পরিবারকে যদি গাঁয়ে থাকতে হয়, তবে সেখানে যা চলছে তা মেনেই থাকতে হবে।' সুতরাং গাঁয়ের এরকম পরিবেশের পরিবর্তন যদি আমরা করতে পারি, তবেই অনেক কাজ হতে পারবে। অনেক আইন হয়েছে। কিন্তু আইন পাশ হলেই যে তা পালিত হতে থাকবে এমন নয়। আমাদের দেশ গণতান্ত্রিক দেশ। আমরা জোর করে কিছু চাপিয়ে দিতে পারি না, কিছুর উপর দখল দিয়ে দিতে পারি না। এ সম্বন্ধে অনুসন্ধান করতে হবে এবং ঠিক পথ বেছে নিতে হবে।

উত্তরপ্রদেশে স্বাধীনতার আগে রাজা-মহারাজাদের বা ইংরেজ সরকারকে 'মাইবাপ সরকার' বলা হত। জীবন-মরণের সব অধিকার সরকারের হাতে ছিল। এখন আমাদের সরকারের হাতে সেই অধিকার নেই। গণতন্ত্রে অনেক বাধা এসে পড়ে। বাধা আসে বলে আমি একে খারাপ মনে করি না। কারণ এতে জনসাধারণের মধ্যে শক্তির বিকাশ হতে পারে, যদি তারা তা চায়। কিন্তু উপর থেকে কোন শক্তি দেওয়া যায় না। ভিতরে শক্তির সৃষ্টি হয় ত তা কাজে লাগে।

বাইরে থেকে উৎসাহ দেওয়া যায়, উত্তেজনা দেওয়া যায়। কিন্তু ভিতরে যে শক্তি থাকবে তাই বাইরে কাজ করতে সাহায্য করবে, সহায়তা করবে। আমি মনে করি যে, গণতন্ত্রে সেই শক্তি বাড়াবার সুযোগ পাওয়া যায়, তা কেউ গ্রহণ করুক বা না করুক। গণতন্ত্র কোন ব্যক্তি বা ব্যক্তিত্বকে দাবিয়ে রাখে না, উল্টো তাকে বাড়াবার সুযোগ করে দেয়।

সমাজে ক্রান্তি আনতে হবে

সমাজে ছোট বড়ো অনেক কাজ আমাদের করতে হবে। ক্রান্তি বা বিপ্লব আনতে হবে। বাবা যেসব কথা বলেছেন তা শুনতে সাধারণ বলে মনে হয়, কিন্তু তা খুবই বৈপ্লবিক কথা। মাটিতে অনেক দূর পর্যন্ত শিকড় গেড়ে রয়েছে। তা বিপ্লবের দ্বারাই তোলা সম্ভব। আমাদের পুরানো সভ্যতায় এমন অনেক কিছু আছে যা এযুগেও খুব উপযোগী। আজই সকালে আমি শান্তিনিকেতনে ছিলাম। তাও একটি গ্রামীণ পরিবেশই, কিন্তু সম্পূর্ণ আলাদা ধরণের। শহর থেকে দূরে ঐ স্থানটি গুরুদেব রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর বেছে নিয়েছিলেন। সেখানে তিনি নতুন জীবন শিখিয়েছেন, নতুন শিক্ষা দিয়েছেন। কিন্তু আজ আমরা শহর থেকে যত দূরেই যাই না কেন যন্ত্রের, শিল্পবিস্তার, বিজ্ঞানের প্রভাব পড়বেই। তা থেকে আমরা রক্ষা পেতে পারি না। তার মধ্যে থেকেই তার উপরে উঠতে পারি। তেমনি সমাজে যেসব খারাপ জিনিস ও সমস্যা রয়েছে সেসবের সঙ্গে লড়াই করে আমাদের উপরে উঠতে হবে।

নারীরা পথপ্রদর্শক হোন

আমি মনে করি যে, নারীরা এসব কাজে যা করতে পারেন পুরুষরা তা পারেন না। অন্যেরা যতই করুন নারীদের মতো তার পরিণাম তত গভীর হবে না, স্থায়ী হবে না। নারীরা কাজ করলে সমাজ পথ দেখতে পাবে, শিশুদের সামনে নতুন আলোর আবির্ভাব হবে। এ কাজ পুরুষের দ্বারা সম্ভব নয়। পুরুষ চাকরি করছে, খারাপ লাগলে তা ছেড়ে দিতে পারে। কিন্তু নারীর কর্তব্য হল সমাজে পরিচ্ছন্নতা

আনার। রাস্তা পুরানো বা নতুন যা-ই হোক না কেন যা ভালো তা নিতে হবে, যা খারাপ তা ছাড়তে হবে। এ এরকম কাজ নয় যে, ইচ্ছে হল ত করলাম, নয়ত ছেড়ে দিলাম। আমরা (নারীরা) এরকম ছেড়ে দিতে পারি না।

এ আন্দোলন বাড়তে থাকুক

আমি বলছিলাম যে, শক্তি ভিতরেই থাকে। কিন্তু বাবার মতো মহাপুরুষ তাঁর বাণীদ্বারা সেই শক্তিকে বাইরে আনায় সাহায্য করতে পারেন,—আমরা সেই সুযোগ গ্রহণ করি বা না করি। কতখানি সাহায্য আমরা নেব তাও আমাদের সামর্থ্যের উপর নির্ভর করে। এ আমাদের সৌভাগ্য যে, বাবার মতো পুরুষকে আমরা আমাদের মধ্যে পেয়েছি। এই আন্দোলন যদি বাড়ে, সংখ্যায় এবং যোগ্যতায়, তাহলে অনেক কিছু আমরা সমাজে করতে পারব। সরকারও করতে পারবে। যেমন শিক্ষার কথা বাবা বলেছেন। আমরা তা নিয়ে চিন্তা করছি, চেষ্টা করছি। কিন্তু আমাদের নড়তে-চড়তে সময় লাগে। যে-কোন বড়ো যন্ত্রের ছোট-ছোট অংশ থাকে। তার কোনও একটি ছোট চাকা, ছোট স্ক্রুও যদি ঢিলা হয়ে যায়, তাহলে যত বড়ো যন্ত্রই হোক না কেন সে অচল হয়ে পড়ে। আমাদের চেষ্টা ত চলেছে যে এই সরকারী যন্ত্র চলুক।

টাকার বদলে খাদ্যশস্যে খাজনা

এখানে আসার আগে আমি রাষ্ট্রপতিজীর সঙ্গে দেখা করতে গিয়েছিলাম। তাঁকে বললাম যে, বাবা আমাকে খাদ্যশস্যের মাধ্যমে খাজনা নেওয়ার কথা বলেছেন। রাষ্ট্রপতিজী বললেন, 'বিচার ত খুব ভালো। কিন্তু কতদূর প্র্যাকটিক্যাল তা দেখতে হবে। তোমাদের গণতন্ত্রে কি তা সফল করে তুলতে পারবে ? কারণ এতে অনেক বেশী ক্ষমতা নিতে হবে এবং দায়িত্বও। চাষীভাইদের কাছ থেকে খাদ্যশস্যে খাজনা নিতে হবে। কিন্তু বেতনের এক অংশও যদি খাদ্যশস্যে দিতে হয়, তাহলে খুব বড়ো দায়িত্ব এসে যাবে।' এ এক ভালো বিচার। কী করে একে সম্ভব করে তোলা যায় তা আমরা দেখছি ও প্রথমে ছোট আকারে কোথাও

চালু করে দেখা যেতে পারে। আমার প্রধানমন্ত্রীত্বের গোড়ার দিকে সরকারী কর্মচারীদের এক খুব বড়ো হরতা'ল আরম্ভ হয়েছিল। আমার মন্ত্রণালয় থেকে বলা হল যে, অত টাকা ত নেই, তার পরিবর্তে কি খাদ্যশস্য বা ছেলেমেয়েদের শিক্ষার খরচ বাবদ কিছু দেওয়া যেতে পারে? যাতে কর্মচারীদের আর্থিক বোঝা কিছু কমে? সেই সময় খাদ্যশস্য দেওয়ার কথা সবাই অস্বীকার করে দিয়েছিলেন। যখন থেকে বাবা আবার ঐ কথা বললেন, তখন থেকে আমরা এসম্বন্ধে অনুসন্ধান করছি, আলোচনা করছি। দেখছি কতদূর পর্যন্ত আমরা তা করে উঠতে পারি। নারীরাও যদি এই বিচারধারা প্রচার করার কাজ হাতে নেন, তবে খুব ভালো হবে। প্রত্যেক কাজে নারীরা এভাবে সাহায্য করতে পারেন। বাবা ত এ নিয়ে ঘেরাও পর্যন্ত করতে বলেছেন। ঘেরাও-এ যদি অত সহজে কাজ হত, তাহলে সবাই ঘেরাও করত। কখনও কখনও ঘেরাও-এ কিছু কাজ হয়েও যায়, কিন্তু তা খুবই সাময়িক। স্থায়ীভাবে কিছু হয় না। স্থায়ীভাবে তখনই কাজ হয় যখন কোনও পরিবর্তনের জন্য সমাজে ইচ্ছার সৃষ্টি হয়। সরকার যদি না-ও চায়, তাহলেও তার উপর চাপ পড়বে এবং সমাজের ইচ্ছানুসারে তাকে পরিবর্তনের কাজ করতেই হবে।

আমাদের কর্তব্য

বর্তমানে নারীদের কর্তব্য কি? এক ত নিজেদের শক্তি বাড়ানো। দ্বিতীয়ত নিজেদের দেশ কী করে এক হতে পারে তা দেখা। যে সমস্ত গুণ আমাদের দেশকে এত মহৎ করেছে, এত বড়ো করেছে, তা হচ্ছে অহিংসা, শান্তি, পরস্পরের বিচার-ধারার প্রতি সহনশীলতা। আমাদের দেশে নানা ধর্ম রয়েছে, নানা জাতি রয়েছে, নানা ভাষা রয়েছে, ত সকলকে নিয়ে সবাই যাতে মৈত্রীভাবে বসবাস করে আমাদের নারীরা তা সম্ভব করে তুলতে পারে। নারীরা ছাড়া অন্য কেউ তা করতে পারে না। পুরুষও করতে পারে, কিন্তু নারীরা যদি এর দায়িত্ব না নেয়, তাহলে এ কাজ হবে না।

বাবার কথা শুনে এবং আপনাদের অনেকেই যাঁরা বহুদূর থেকে এসেছেন, তাঁদের সকলের সঙ্গে মিলিত হতে পেরে আমি খুবই আনন্দ পেয়েছি। আশা করি আপনারা এখান থেকে নতুন প্রেরণা নিয়ে নিজ-নিজ রাজ্যে যাবেন, নারী-সংগঠন গড়ে তুলবেন এবং সামগ্রিকভাবে নারীশক্তিকে জাগ্রত করবেন। সরকারের কোন ভুল-ত্রুটি হলে আপনারা অবশ্যই সেসম্বন্ধে বলবেন, জোরের সঙ্গে বলবেন, আন্দোলনও করবেন। কিন্তু সরকার যেসব কাজ সঠিকভাবে করবে তাতেও আপনারা সহায়তা করতে চেষ্টা করবেন।

আপনাদের কাছে আমি কৃতজ্ঞ। আপনাদের জন্যে আমার শুভেচ্ছা রইল।